KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : সৌরীন্দ্রনাথ দত্ত
Title : অনিমাদের বাড়ি	Size : 4.5" X 6.75" 11.43 X 17.14 c.m.
Vol. & Number : ১৩/৮ ১৩/১০ ১৪/১-৬	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ শ্রাবণ, ১৩৪৮ কার্তিক, ১৩৪৮ – চৈত্র, ১৩৪৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সত্যকিরণ দত্ত, অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত	Remarks : No. of Pages missing.

CD Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
... সেন, কলকাতা-৭০০০০৯

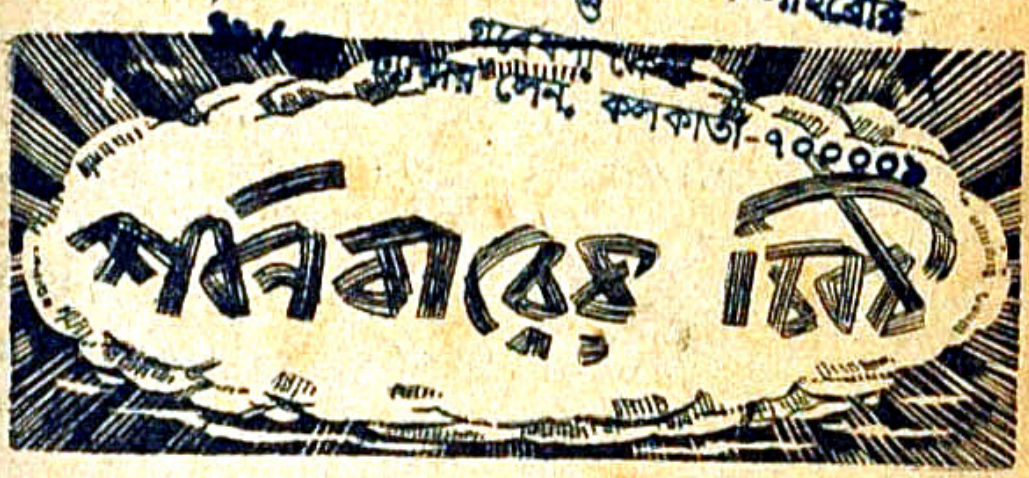

শনিবারের চিঠি

১৩শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৪৮ [১০ম সংখ্যা

বাংলা ছন্দ ও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গতবারে বাংলা ছন্দের পর্ব্বভূমক ছন্দভাগের হিসাবে একটা ভুল হইয়া গিয়াছে—লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। ছন্দের সঙ্গীত-রস ছাড়িয়া, তাহার অ্যানাটমি সন্ধান করিতে বসিলে কাব্যরসিক ভদ্রলোক-মাত্রেরই এইরূপ 'ব্যভ্রম' হওয়া স্বাভাবিক—কারণ, 'যার কাজ তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে'। আমি যে বারো-মাত্রাকেই এইরূপ ছন্দভাগের দীর্ঘতম পরিমাণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তাহা যে ঠিক নয়—এ কথা তো আপনারাও জানিতেন; অতএব আমারও জানা উচিত ছিল, জানিতামও নিশ্চয়! কিন্তু ক্রমাগত গণিত ও ব্যাকরণের তাঁবেদারি করিলে সহজ জ্ঞানও লোপ পাইয়া থাকে। আমার চেয়ে অনেক বড় ছন্দ-পণ্ডিতেরও এ রকম অবস্থা হয়; তফাৎ এই যে, সেখানে

গণিত ঠিক থাকে—ছন্দই মারা যায়। বারো মাত্রা ভাগই যে দীর্ঘতম নয়, তার প্রমাণ আপনারা অনেক আগেই পাইয়াছেন, যথা—

খাঁচার পাখী ছিল • সোনার খাঁচাটিতে /
বনের পাখী ছিল বনে।

—এখানে প্রথম ছন্দভাগটি (Rhythmical section) চৌদ্দ মাত্রার; দুইটি সাত মাত্রার পর্ব্ব ইহাতে আছে। পর্ব্ব ত্রৈমাত্রিক ছয় মাত্রার হইলে, দুইটি পর্ব্বে বারো মাত্রা হয়, এবং তাহাই সে ছন্দের দীর্ঘতম ছন্দভাগ। এখানেও মাত্রার সংখ্যা যেমনই হোক—পর্ব্ব-সংখ্যা দুইটিই। তবে কি পর্ব্বভূমক ছন্দের দুইটি পর্ব্বেই বৃহত্তম ছন্দভাগ হইয়া থাকে? চার মাত্রার দুইটি পর্ব্বে তাহা কিন্তু হয় না, সেখানে ঐ বারো মাত্রা পর্য্যন্ত তাহারও সীমা, যথা—

ছায়া নামে • তমালের • বনে বনে

আবার, পাঁচ মাত্রার চালেও এই ছন্দভাগ দীর্ঘতম বলিয়া মনে হয়—

একদা তুমি • ফিরিতে যবে • অঙ্গ ধরি।
পথিক বধূ • কাঁদিত কত • মিনতি করি।

এখানেও, তিনটি পর্ব্বে এই দীর্ঘতম ছন্দভাগ পাওয়া গিয়াছে, এবং ইহার মাত্রা-পরিমাণ পনরো। অতএব এই পনরোকেই উর্দ্ধতম মাত্রা-সংখ্যা ধরিলে ভুল হইবে না। ছন্দভাগের ন্যূনতম মাত্রা-সংখ্যা, অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম ছন্দভাগের কথাও—এখানে আর একবার বলিব। দীর্ঘতম ও ক্ষুদ্রতম আকারের মধ্যবর্ত্তী যে নানা ছোট-বড় ছন্দভাগ পাওয়া যায়—খণ্ডপর্ব্বের সাহায্যেই তাহা হইয়া থাকে। অতএব খণ্ডপর্ব্বহীন একটি মাত্র পর্ব্বে ক্ষুদ্রতম ছন্দভাগ বা খণ্ড-চরণ হইয়া থাকে—মোটামুটি এমন নিয়ম নির্দ্দেশ করিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু ইহাও নির্ভর করিবে চরণের গঠনের উপরে; এবং পর্ব্বের আয়তনও সেই পক্ষে সুবিধাজনক হওয়া চাই। আমার মনে হয়, ছয় মাত্রাই

সকল পর্ব্বভূমক ছন্দভাগের ন্যূনতম পরিমাণ,—পূর্ব্বে যে আট মাত্রার কথা বলিয়াছিলাম, তাহাও সংশোধন করিয়া লইলাম।

চার মাত্রার দ্বৈমাত্রিক ছন্দ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। চার মাত্রার বলিয়া—এই ছন্দের চলনে কোন বৈচিত্র্য বা জটিলতা নাই; কেবল এক হইতে তিন মাত্রার খণ্ডপর্ব্ব, এবং পর্ব্ব-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে যাহা কিছু বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার একটা বিশেষ সুবিধা এই যে—হসন্ত, স্বরান্ত ও যুক্তবর্ণের সমাবেশে, ইহার সুর অনায়াসে সকল পর্দ্দায় উঠিতে ও নামিতে পারে; পূর্ব্বে তাহার উদাহরণ দিয়াছি। পর্ব্বভূমক ছন্দের সাধারণ রেওয়াজ ত্রৈমাত্রিক—তার কারণ বোধ হয় এই যে, ত্রৈমাত্রিকই পয়ার হইতে অধিকতর বিলক্ষণ; দ্বৈমাত্রিকে পর্ব্বস্পন্দ থাকিলেও, পয়ারের সঙ্গে উহার একটা গূঢ় সগোত্রতা আছে। তাই, আমাদের কবিরা ত্রৈমাত্রিকের স্বাদ-বদলের জন্যই, দ্বৈমাত্রিককে বেশ একটু রকম-ফেরের মত উপভোগ করেন। এই ছন্দের ছন্দভাগ সাধারণত=(৪+৪) ৮ মাত্রার হইয়া থাকে, এবং এই ৮ সর্ব্বত্র ৪+৪ না হইয়া অনায়াসে ৬(৩+৩)+২ হইয়া থাকে; ত্রৈমাত্রিক ছন্দভাগও এইরূপ ৬+২ হয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। অতএব এই আটের মধ্যে তিন ও চার মাত্রার লুকাচুরি খেলা সব সময়েই সম্ভব; অর্থাৎ, এই গঠনের ছন্দভাগে Rhythmical variation-এর বড়ই সুবিধা হয়। দ্বৈমাত্রিক ছন্দে, লয় ঠিক রাখিয়া, এই ৩+৩+২ এবং ৪+৪ কেমন মিলিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত—

হাঁগো, এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে—
তাহারে সুধানু হেসে
যেমনি,

অমনি কথা না বলি,
ভরাঘট ছলছলি,
নতমুখে গেল চলি
তরুণী
এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী। (রবীন্দ্রনাথ)

—এখানে এই পুঞ্জপদী কবিতাটির প্রথম দিককার ছন্দভাগ—৩+৩+২, কিন্তু শেষের দিকে ৪+৪-এর গঠন আছে। লয় হিসাবে ইহারা সর্ব্ব এক—প্রথম দিকে তাহা মোট আটের মধ্যে মিলাইয়া আছে, শেষে দিকে চারের চাল স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। এইরূপ গঠনের লয়ে কথা আমি পূর্ব্বে, ত্রৈমাত্রিক ও পয়ার উভয়বিধ ছন্দের প্রসঙ্গে, ব্যাখ্য করিয়াছি। উপরে উদ্ধৃত কবিতাটিতে আর একটি বিষয় লক্ষ করিবার আছে, প্রথম দিকে স্পষ্ট চারের পর্ব্ব না থাকায়—এ ত্রৈমাত্রিকের তরঙ্গ-প্রয়াতও থাকায়, ছন্দ অপেক্ষাকৃত মন্দগতি হইয়াছে কিন্তু শেষের দিকে, তাহা হ্রস্বতর পর্ব্ব-স্পন্দের সুযোগে দ্রুততর হই ভাবকেও কেমন রূপ দিয়াছে! আট মাত্রার ছন্দভাগের এই দ্বৈমাত্রি চাল যেন পদ ও পর্ব্বের সমন্বয়-স্থল—ইহাতে ত্রৈমাত্রিক ৩+৩+২ দ্বৈমাত্রিক ৪+৪ যেমন নিহিত আছে, তেমনই, পয়ারের আট মাত্রা পদও যেন ইহাকে পিছন হইতে ধরিয়া আছে। এজন্য ইহা দ্বা ভাব-অনুযায়ী সব রকমের লয় সৃষ্টি করা যায়।

তথাপি, এইরূপ ছন্দভাগ ঐ তিন ঠাটেই সম্ভব হইলেও, ঝোঁক পর্ব্বস্পন্দ হিসাবে তাহা এক নয়। পর্ব্বভূমক ছন্দে ইহাতে দুই বেশি ঝোঁক পড়িবে না।

হাঁগো-এ কা • দের-দেশে
বিদে-শী না • মিনু-এসে

—এই দ্বৈমাত্রিক লয় যেমন এখানেও রহিয়াছে, তেমনই ঝোঁক প্র

চারের হিসাবে একটা করিয়াই আছে, কেবল Rhythmical Variation-এর জন্য একটু ওলট-পালট হইয়াছে, যথা—

হাঁ গো এ / কাঁদের দেশে,
বিদেশী / নামিনু এসে—

শেষের দিকের—

ভরা-ঘট • ছল-ছলি
নত-মুখে • গেল-চলি

—প্রভৃতির গঠনে ঝোঁক যেমন নিয়মিত, তেমনই, দুই মাত্রার টুকরাগুলি ছন্দের গতিকে তুরঙ্গ-প্রয়াত করিয়া তুলিয়াছে। আট-মাত্রার পয়ারের পদে, ঝোঁক যেমন ভিন্ন প্রকৃতির—তেমনই তাহার নিয়মও স্বতন্ত্র; যথা—

মনে পড়ে বরিষার / বৃন্দাবন অভিসার (রবীন্দ্রনাথ)

কিংবা

শ্যামল তমাল তল / নীল যমুনার জল (ঐ)

—এখানে, আদ্য-ঝোঁক, যুক্তবর্ণের জন্য পূর্ব্বাক্ষরের স্বরসংকোচ, এবং হসন্ত-শেষ অক্ষরের স্বরপ্রসারণ প্রভৃতির ফলে, ছন্দের তরঙ্গ সম্পূর্ণ অন্যরূপ, যেমন—

মনে পড়ে বরিষা-র / বৃ ন্দা ব ন অ ভি সা-র

এবং—

শ্যামল্ ত মা-ল্ ত ল্ / নী-ল্ য মু না-র জ ল্

অথবা, আরও টানিয়া—

শ্যাম-ল্ ত মা-ল্ ত-ল্ / নী-ল্ যমু না-র জ-ল্

সর্ব্বশেষে, আমি এই চার মাত্রার পর্ব্বভূমক ছন্দের একটা সুবিধার কথা বলিব। এই ছন্দেই, বাংলায় সংস্কৃতের মত দীর্ঘতম চরণ গঠন করা যায়; শুধু তাহাই নয়, সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের তরঙ্গায়িত ছন্দে এক একটি বৃহত্তর পদও যেমন পরবর্ত্তী পদের অনুধাবন করিয়া অপূর্ব্ব সুর-গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি করে, তেমনই, এই ছন্দেও সেইরূপ দীর্ঘচ্ছন্দ সুর-তরঙ্গের অবকাশ আছে, যথা—

মুখরিত দিগ্‌দশ • চকিত জগজ্জন / পবন চলিত মৃদু • মন্দে (অজ্ঞাত)

* * *

পতন-অভ্যুদয় • বন্ধুর পন্থা / যুগ-যুগ ধাবিত • যাত্রী

—যেমন, তেমনই—

ডুববে পাহাড় বন • ডুবে যাবে চরাচর / ধরণীর উন্মাদ • নৃত্যে,
অদূরে গুহার মুখে • সিংহের গর্জ্জন / শিহর তুলিবে তব • চিত্তে।
('ঘাসের ফুল')

৮

পর্ব্বভূমক ছন্দের কথা এই পর্য্যন্ত। ইহার পরে, আমি ছড়ার ছন্দ ও কথ্যবাংলার ছন্দ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। সাধুভাষার ছন্দ হইতে যখন এই ছন্দে আসি, তখন ভাষার উচ্চারণ-রীতিগত প্রভেদ খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমরা যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করি, অথবা—করিতাম (কারণ, এখন উভয় ভাষাতেই তাহা করা হইতেছে), তাহার উচ্চারণে স্বরধ্বনির প্রাধান্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। স্বরযুক্ত না হইলে অক্ষর বা syllable হইতে পারে না ইহা সত্য, কিন্তু সাধুভাষার যে ধ্বনিপ্রকৃতি, তাহাতে স্বরের মর্য্যাদা যতখানি বিদ্যমান, কথ্য বাংলায় তাহা নাই। ওখানে ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরের যে শাসন মানে, এখানে স্বরধ্বনি সেইরূপ ব্যঞ্জনের শাসন মানে; ওখানে যাহা ব্যঞ্জনাশ্রিত স্বর, এখানে তাহা স্বরারূঢ় ব্যঞ্জন। ওখানে মাত্রার হিসাবে যুক্তাক্ষরে

যে কারণে যে ওজন আছে, এখানে তাহা নাই; মাত্রার একরূপ হিসাব এখানেও আছে, কিন্তু সে হিসাবে স্বর-সংকোচন বা প্রসারণের প্রশ্ন নাই—মধ্যস্থ বা অন্তস্থ বর্ণে স্বরের অভাবে, শব্দের আদ্য-অক্ষরে যে টঙ্কার উৎপন্ন হয়, তাহাকেই সম্পূর্ণ করিবার জন্য যে কয়টি ধ্বনিস্থানের আবশ্যক, তাহারই একটা হিসাব আছে। বাংলা উচ্চারণে সর্ব্বত্র শব্দের বা বাক্যাংশের আদিতে যে ঝোঁক পড়ে—যে ঝোঁক পর্ব্বভূমক এবং পদভূমক ছন্দেও ভিন্ন প্রকারে কাজে লাগে, সেই ঝোঁক এই ছড়ার ছন্দে—ভাষা ব্যঞ্জনবহুল বা হসন্তপ্রধান বলিয়া—একটু স্বতন্ত্র ক্রিয়া করিয়া থাকে। কথ্যবাংলার বাক্য ছন্দিত হইতে গেলেই ওই ঝোঁকেরই বিশিষ্ট শক্তির গুণে, চারিটি ধ্বনিস্থান লইয়া এক একটি পর্ব্ব গড়িয়া উঠে; এই চারের রহস্য বাংলা বাক্-প্রকৃতিরই আদি রহস্য, তাই কথ্য বাংলায় তাহা এমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। আমি শব্দের আদি অক্ষরে যে টঙ্কার উৎপন্ন হওয়ার কথা বলিয়াছি, এবং তাহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি—সেই বাংলা উচ্চারণ-রীতিই—সাধুভাষার ছন্দেও আছে; কিন্তু এই ছড়ার ছন্দে সেই ঝোঁক যে উপায়ে ঐ ছন্দকে রূপ দেয়, তাহা যে ঐ মধ্য বা অন্ত্য হসন্ত বর্ণের কারণে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব এই ছন্দের সাধারণ রূপটির প্রধান উপাদান দুইটি—(১) ইহার ধ্বনিস্থানের সংখ্যা সর্ব্বদাই চার, (২) আদ্য-বর্ণের ঝোঁকটিকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য ধ্বনিস্থানের উপযুক্ত অবকাশে হসন্তের সন্নিবেশ। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত লওয়া যাক, যথা—

বিষ্টি পড়ে / টাপুর-টুপুর / নদী এল / বান

—'নদেয় এল বান' নয়। এখানে প্রত্যেক অক্ষর বা স্বরান্ত বর্ণই গণনীয়, এবং সেই গণনায় চারিটি করিয়া ধ্বনিস্থান পাওয়া যাইবে। তথাপি, তাহা চার মাত্রা নয়, কারণ এই অক্ষরগুলি আদ্য-অক্ষরের

ঝোঁককে ধারণ করিয়া থাকে মাত্র ; ধ্বনিগুলির যে কাল-পরিমাণ তাহা পিণ্ডীকৃত হইয়া, ছন্দের তাল রক্ষা করে—অক্ষরের কোন গৌরব বা পৃথক মর্য্যাদা রক্ষা করে না। এই ভাষায় যুক্তাক্ষরের কোন বিশেষ মূল্য নাই—সকল বর্ণ ই মুক্ত, কেহ যুক্ত নয় ; এখানে যুক্তবর্ণ কার্য্যত পরস্পর অযুক্ত থাকে, হসন্তই থাকে ; এবং ঐ মধ্যস্থ হসন্ত পূর্ব্ব-অক্ষরের স্বরকে সংকুচিত বা প্রসারিত করে না, তাহার 'ঝোঁক', বা উচ্চারণ-ক্রিয়ার জোরকে বর্দ্ধিত করে মাত্র—ইহাকে accent বা স্বরবৃদ্ধি, stress বা ঠেস, বলা যাইতে পারে। সাধুভাষায় যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব অক্ষরে যেটুকু জোর বা স্বরবৃদ্ধি ঘটে, তাহা এইরূপ 'ঠেস' হইতে স্বতন্ত্র ; সে উচ্চারণে এইরূপ ঠক্কর বা উঁচট খাওয়া নাই, দ্রুততাও নাই, একটু দীর্ঘত্ব অথবা স্বরের গুরুত্ব আছে মাত্র। কিন্তু—'বিষ্টি পড়ে'-র 'বিষ্‌টি'তে—যুক্তাক্ষর নয়—হসন্তই ধর্ত্তব্য ; তাহার ফলে, পূর্ব্ব-অক্ষরে যাহা ঘটে, তাহাকে আমি 'স্বর-বিস্ফোরণ' বলিব, এবং ইহাতেও একরূপ ব্যঞ্জন-সংঘাতই ঘটিয়া থাকে। সাধুভাষায় স্বরের প্রাধান্য থাকায় 'বৃষ্টি' এই শব্দটির উচ্চারণ—বৃ-ষ্‌+টি (স্বর-প্রসারণ) এবং বৃ'ষ্‌+টি (স্বর-সঙ্কোচ)—এই দুই প্রকার হইতে পারে। কিন্তু এই ভাষার উচ্চারণে, 'বিষ্টি'র 'ষ্‌'—পূর্ব্ব অক্ষরের স্বর-বিস্ফোরণের ফলে যেন ছিটকাইয়া উঠিয়া দুইদিকের ব্যঞ্জনধ্বনিকে সংঘট্টিত করিয়া তোলে, যথা—'বি'ষ্‌টি ; সাধুভাষার উচ্চারণে দুই ব্যঞ্জনের মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকে, এখানে তাহা থাকে না। সাধুভাষার এই উচ্চারণ-ধর্ম্মই তাহাকে প্রাকৃত ভাষা হইতে এমন বিলক্ষণ করিয়াছে ; এখানে যে ধ্বনি ভেক-প্রলম্ফী, সেখানে তাহা গজেন্দ্রগামী ; এখানে যাহা রীতিমত 'ঠেস', ওখানে তাহা মাত্রার একরূপ গুরুত্ব বা দীর্ঘত্ব ; এবং পর্ব্বভূমক ছন্দে পর্ব্বের সঙ্কীর্ণ অবকাশে পূর্ব্বাক্ষরের সেই গুরুত্বই, দ্রুততর গতির সুবিধা পাইয়া একটু নাচিয়া

উঠে মাত্র ; কিন্তু সেখানেও দুই ব্যঞ্জনের মধ্যে একটু ফাঁক থাকে—স্বরবিস্ফোরণের দ্বারা এমন সংঘট্টিত হইতে পারে না।

কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে…
রক্ততিলক ললাটে পরাল (রবীন্দ্রনাথ)

ইহাদের পর্ব্বগুলির লয় একই, এজন্য, 'কাদের', 'গগন', 'তিলক' প্রভৃতির আদ্য-অক্ষরের উচ্চারণে জোর যতখানি, 'কণ্ঠে', 'রক্ত' প্রভৃতিতেও ততখানি হওয়াই সঙ্গত—'ক"ণ্‌ঠে', 'ম"ন্‌থে' না হইয়া 'কণ + ঠে' 'মন্‌+থে' হওয়াই আবশ্যক।

কথ্যভাষায় স্বরধ্বনির এই লীলার অবকাশ না থাকায় ইহার অক্ষরের কোন মাত্রা-গুণ নাই—বাংলা সাধুভাষায় সেই গুণ যেটুকু যে হিসাবে বিদ্যমান আছে, এখানে সেটুকুও নাই। তথাপি, একটা মাপ না থাকিলে ছন্দ হয় না ; এখানে সেই মাপ কি হিসাবে আছে, তাহা বলিয়াছি ; প্রত্যেক পর্ব্বে স্বর বা স্বরান্ত বর্ণের একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায় বলিয়া, এই ছন্দকে একপ্রকার অক্ষরবৃত্ত পর্ব্বভূমক-ছন্দ নাম দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলা কাব্যে এই ছন্দের প্রসার পূর্ব্বে তেমন ছিল না ; তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে—ছড়া, ব্রতকথা এবং অতি প্রাচীন প্রবচনের অনেক পংক্তি এই ছন্দে রচিত হইয়া থাকিলেও, যখন হইতে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক কর্ষণ সুরু হইয়াছে, এবং বোধ হয়, তজ্জন্য শিষ্ট-সমাজে মুখের ভাষাতেও যখন সেই সংস্কৃতির প্রভাব পড়িতে সুরু করিয়াছে, তখন হইতেই সকল পদ্য-রচনাতে পয়ারের ভঙ্গিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেখা যায়। আমি নিম্নে দুই চারিটি প্রবচন উদ্ধৃত করিতেছি। এগুলি খুব শুদ্ধ সাধুভাষার রচনা নয়, তথাপি ইহাদের ছন্দও ছড়ার ছন্দ নয়। ইহা হইতে মনে হয়, বাংলা ভাষার আদিম প্রকৃতি ও তাহার

পদ্যচ্ছন্দ যেমনই হউক—সেই আদিমতা অনেক দিনই ঘুচিয়াছে, মুখে বুলি যখনই রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছে, তখনই, উচ্চারণে ও ছন্দে সেই আদি ভঙ্গি পরিত্যক্ত হইয়াছে, যথা—

পরের সোনা না দিও কানে।
প্রাণ যাবে তোর হেঁচকা টানে।
* *
যত হাসি তত কান্না।
বলে গেছে রামশরণা।
* * *
মঙ্গলে উষা বুধে পা।
যথা ইচ্ছা তথা যা।
* * *
মনের অগোচর পাপ নেই।
মার অগোচর বাপ নেই।
* * *
যার শিল যার নোড়া।
তারি ভাঙি দাঁতের গোড়া।
* * *
থাকতে দিল না ভাত কাপড়।
মরলে করবে দানসাগর।
* * *
দশে মিলি করি কাজ।
হারি জিতি, নাহি লাজ।
* * *
যত ছিল নাড়া-বুনে।
সব হ'ল কীর্ত্তনে।
* * *
বিবাহ তৃতীয় পক্ষে।
সে কেবল পিত্তি রক্ষে।
* * *
ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন
বাইরে কোঁচার পত্তন।

উপরের প্রবচনগুলির পদ্য-ভঙ্গি স্পষ্ট পয়ারের, অর্থাৎ—মাত্রিক

হসন্তের গোলমাল যেখানে যেটুকু আছে, তাহা রচনার দোষ—সে দোষ সেকালের সকল কবিদের রচনায় আছে। অতএব, দেখা যাইতেছে, ছড়ার ছন্দ চিরদিনই অতিশয় গ্রাম্য ও মেয়েলী রচনায় আপনা হইতেই আসিয়া পড়িত বটে, কিন্তু তাহা অতিশয় চল্‌তি প্রবচনের মধ্যেও গ্রাহ্য হয় নাই।

এই ছড়ার ছন্দকে ইদানীন্তন কালে, প্রথমে রবীন্দ্রনাথ, ও পরে সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিগণ একটি বিশিষ্ট ছন্দধ্বনির গৌরবে উন্নীত করিয়া, তাহাকে বাংলা গীতিকবিতায় এক অভিনব সঙ্গীত-সৃষ্টির কাজে লাগাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসাধারণ গীতি-প্রতিভার বলে, কেবল কাব্যরস-সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে ইহাকে যে ভাবে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহাতে ইহার ধ্বনিপ্রকৃতির গাণিতিক হিসাব বা অক্ষরবিন্যাসের সূক্ষ্ম পারিপাট্যের বালাই নাই; কেবল পর্ব্বসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, বিবিধ চরণ-গঠন, এবং শব্দযোজনার যাদুমন্ত্রে, তিনি এই ছন্দকে কাব্যের কৌলীন্য দান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথই এই ছন্দের যৎপরোনাস্তি কর্ষণ করিয়া, ইহার বিশিষ্ট ধ্বনি হইতেই নানা ভঙ্গির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। আমি প্রথমে এ ছন্দের আদি রূপের কথাই বলিব।

বিষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদী এল / বান

অথবা,

কুঁকলি / আমি তারেই / বলি,

কালো তারে / বলে গাঁয়ের / লোক (রবীন্দ্রনাথ)

—ইহাই এ ছন্দের আদি রূপ—প্রতি পর্ব্বে চারিটি স্বরান্ত বর্ণ বা অক্ষর, এবং প্রতি পর্ব্বের আদ্য-অক্ষরে একটি করিয়া ঝোঁক। এই ঝোঁকের

কথা আগে বলিয়াছি। বারবার পড়িলেই বোঝা যাইবে—এই ঝোঁকের জন্য, ঐ আদ্য-অক্ষরের সঙ্গে একটি হসন্ত-বর্ণ থাকা আবশ্যক—যেমন, 'বিষ্-টি পড়ে', 'কৃষ্-ণ-কলি' ; কিন্তু 'টাপুর টুপুর'-এ আদ্য-অক্ষরের পরেই হসন্ত নাই—প্রথম শব্দটির অন্তে আছে, এবং তাহাতেই ওই ঝোঁকের পুষ্টিসাধন হইয়াছে। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এই পর্ব্বের শেষের হসন্ত কোন কাজই করিতেছে না—না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। বাকি অপর পর্ব্বগুলিতে, এইরূপ স্থানে—আদিতে বা অন্তে হসন্তবর্ণ নাই ; তাহার ফলে, ঝোঁকগুলি স্বচ্ছন্দ বা স্বাভাবিক না হইয়া একটু অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। অবশ্য, যদি শব্দের উপরে Rhetorical ঝোঁক বা Emphasis থাকে, তাহা হইলে হসন্তের এইরূপ পৃষ্ঠ-পোষকতার প্রয়োজন হয় না—যেমন, 'কালো তারে'—এখানে 'কালো'র উপরে অর্থের জোর থাকায় হসন্তের অভাব ধরা পড়ে না। তেমনই—

আমি নাবব / মহাকাব্য
সংরচনে,
ছিল মনে—
ঠেকল কখন / তোমার কাঁকণ
কিঙ্কিণীতে—(রবীন্দ্রনাথ)

—এখানে সব, কয়টি পর্ব্বেই—হয় হসন্ত, নয় অর্থঘটিত জোরের দ্বারা—আদ্য-অক্ষরের ঝোঁক বজায় আছে ; কেবল 'ছিল মনে'র 'ছি' অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, কারণ ইহাতে কোনটাই নাই। 'ছিল মনে' যদি 'ছিলেন মনে' হইতে পারিত, তবে এই দোষ ঘটিত না, কারণ, হসন্তটি আদ্য-অক্ষরে যুক্ত না থাকিয়া যদি শব্দের শেষেও থাকে, তাহা

হইলেও ঝোঁকটির বলহানি হয় না। এখানেও লক্ষ্য করা যাইবে যে, পর্ব্বের অন্তস্থিত হসন্তের কোন পৃথক মূল্য নাই।

অতঃপর প্রশ্ন উঠিতে পারে—ছড়ার ছন্দের এই যে পর্ব্ব, উহাতে কয়টি হসন্ত বর্ণ স্থান পাইতে পারে ? কারণ, আমরা দেখিয়াছি উপযুক্ত স্থানে একটি হসন্ত বর্ণ থাকিলেই এ ছন্দের ঝোঁকঘটিত প্রয়োজন সম্পূর্ণ হয়, এবং ঝোঁকযুক্ত আদ্যবর্ণ ও তিনটি স্বরান্ত বর্ণের দ্বারা ইহার পর্ব্বগত ধ্বনিপরিমাণও পূরণ হইয়া থাকে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পর্ব্বান্তিক হসন্ত বর্ণে ইহার ধ্বনি-পরিমাণ ক্ষুণ্ণ বা পূর্ণ হয় না। তবে কি চারিটি ধ্বনিস্থানেই অক্ষরের সঙ্গে হসন্ত বর্ণ থাকিলে ক্ষতি নাই ? তাহা নহে। আদ্য-ঝোঁকের জোরে হসন্তবর্ণের ধ্বনি যতই অবলুপ্ত হউক, উহার সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে পর্ব্বমধ্যে একটা ভার-সঞ্চার হয়—দেখা যায় যে, একই পর্ব্বে অতিরিক্ত হসন্তবর্ণ দুইটির বেশি হইলে ছন্দপীড়া ঘটে, অথচ যথাস্থানে একটি থাকিলেও কাজ চলিয়া যায়। অতএব বলা যাইতে পারে, এই ছন্দের পর্ব্বগত ধ্বনি-পরিমাণের একটা স্থিতিস্থাপকতা আছে, এবং তাহারও একটা সীমা আছে। চারিটি স্বরান্ত বর্ণ, এবং আদ্য-অক্ষরের ঝোঁকের জন্য একটি হসন্ত বর্ণ—ইহাই ইহার ন্যূনতম হিসাব হইলেও, আর একটি মাত্র হসন্ত বর্ণকে সে হেলায় বহন করিতে পারে। তিনটিতে ছন্দ পীড়িত হয়—তখন সেই তিনটির দুইটিকে একটি স্বরান্তের ওজন দিয়া পর্ব্বরচনা করিলে, ভারসাম্য কতকটা রক্ষা হইয়া থাকে ; যথা,—

আয় আয় সই • জল আনিগে • জল আনিগে • চল্ ('ইন্দিরা')

—ইহার প্রথম পর্ব্বটিতে তিনটি মাত্র অক্ষর (syllable) ও তিনটি হসন্ত বর্ণ আছে ; কিন্তু তাহাতেই পর্ব্বের ধ্বনি-পরিমাণ বজায় আছে ; কারণ, ঐ তিনটি হসন্তের দুইটিতে একটি অক্ষরের কাজ করিতেছে।

কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, (কোন এক ছন্দ-পণ্ডিত যেমন বলিয়াছেন) এই ছড়ার ছন্দে মাপের কোন নির্দ্দিষ্ট হিসাব নাই। বরং, ইহাই বলা যাইতে পারে যে, এই ছন্দের মাপ অতিশয় সহজ ও সুনির্দ্দিষ্ট—হসন্তবর্ণের জন্য সে মাপের কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। কেবল ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, একটিও হসন্তবর্ণ না থাকিলে পর্ব্বটি পঙ্গু হইয়া থাকে, এবং দুইয়ের বেশি হইলে ছন্দ টলিতে থাকে। আমি আরও সূক্ষ্ম হিসাবের মধ্যে যাইব না—বিশেষ জানিবার জন্য, সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধটি পাঠ করিতে বলি।

এই ছন্দের সাধারণ রূপ যাহা, তাহাতে অধিক বৈচিত্র্য নাই—পর্ব্বের সংখ্যা কম বা বেশির জন্য, এবং নানা আকারের খণ্ড-পর্ব্বযোগে, যাহা কিছু বৈচিত্র্য ঘটে ; নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।—

(১) চারিটি পর্ব্ব আছে, খণ্ডপর্ব্ব নাই।—

এই যে ছিল • সোনার আলো • ছড়িয়ে হেথা • ইতস্ততঃ
আপ্‌নি খোলা • কম্‌লা-কোয়ার • কম্‌লা ফুলি • রোয়ার মত।
(সত্যেন্দ্রনাথ)

(২) চার পর্ব্ব ও এক খণ্ডপর্ব্ব—বৃহত্তম চরণ। (খণ্ডপর্ব্ব এক হইতে তিন অক্ষরের হইতে পারে, তাহাতে এই চার পর্ব্বের চরণটি একটু ছোট-বড় হইয়া থাকে।)—

ওখানে ঠাঁই / নাই প্রভু আর / এই এসিয়ায় / দাঁড়াও সরে' / এসে—
বুদ্ধ-জনক /-কবীর-নানক /-নিমাই-নিতাই /-শুক-সনকের / দেশে। (সত্যেন্দ্রনাথ)

(৩) তিনটি পর্ব্ব—খণ্ডপর্ব্ব নাই—

অযুত ঢেউয়ের / তপ্তনিশাস / সুপ্তিহারা,
ফির্‌তেছিল / হাওয়ায় ছায়া /-মূর্ত্তি পারা। (সত্যেন্দ্রনাথ)

(৪) Hypermetric বাদে, মূল চরণে তিনটি পর্ব্ব ও একটি ২ অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব—

ওরে বিহান হ'ল • জাগো রে ভাই • ডাকে পর•স্পরে
(রবীন্দ্রনাথ)

(৫) তিনটি পর্ব্ব ও একটি ৩ অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব—

স্বর্ণ-শরে • পূর্ণ একি • গন্ধরাজের • তূণখানি। (সত্যেন্দ্রনাথ)

(৬) তিনটি পর্ব্ব ও একটি ১ অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব—

এস তুমি • যূথির বনে • দুকূল দুলা • বে (ঐ)

* * *

অশ্রুমেঘের • শ্রাবণ দেখে • বন্ধু কোথা • যাও (ঐ)

(৭) দুইটি পর্ব্ব ও একটি খণ্ডপর্ব্ব—

শামার শিসে / সুরের স্তবক / হেন,
প্রাণ ছিল যার / গানের উছ্বাস /-ভরা,
কণ্ঠ তাহার / হঠাৎ নীরব / কেন,
শিউলি-বীথির / শেষ বুঝি ফুল /-ঝরা। (ঐ)

(৮) একটি পর্ব্ব ও একটি ৩ অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব ; তিন অক্ষর হইলেও দুই স্থানে দুই রকমের গঠন লক্ষণীয়।—

তোর চুমাতে • হয় যে লাল।

খোকাখুকীর • হাত পা গাল। (সত্যেন্দ্রনাথ)

* * *

কিশোর কিশ•লয় পরে
তোমার পরশ • সফরে (ঐ)

উপরে ছড়ার ছন্দের কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলাম, ইহাতে সেই পুরানো ছড়ার—

আয় বৃষ্টি • হে—নে।

ছাগল দেবো • মে—নে।

—সেই ছাঁদটি, নানা আকারের চরণে—

সবুজ পরী টল্‌ল না।
তোমার ভয়ে ভুল্‌ল না। (সত্যেন্দ্রনাথ)

—হইতে দীর্ঘতম চরণে ও বিচিত্র খণ্ডপর্ব্বে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে তথাপি, আদি ছড়ার-ছন্দের এই ছাঁদ, ধ্বনি-বৈচিত্র্যে পয়ার পর্ব্বভূমকের মত সম্পদশালী নয়। সত্যেন্দ্রনাথ হসন্তের কৌশলে মাত্রাবৃত্তের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা এই ভাষার এই ছন্দই নয় এবং ইহার চার অক্ষরের পর্ব্বকে দুইয়ে বা তিনে ভাঙিয়া তিনি যে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাও অতিরিক্ত কৌশলসাপেক্ষ,— ইহা মনে রাখিলে, এ ছন্দের এই একঘেয়ে চারের চালই যে উহা সেই বৈচিত্র্যহীনতার কারণ, এবং এই ভাষার স্বরধ্বনির দৈন্যই যে, এ কৌশলসত্ত্বেও ইহার সঙ্গীত-গুণকে গ্রাম্য-ছড়ার অধিক উর্দ্ধে উঠিতে হইতে দেয় নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমাদের কথ্য স্বভাবে যে আদ্য-ঝোঁক অলঙ্ঘনীয়, তাহার জন্যই এই ছন্দেও, accent বা স্বরবৃদ্ধির স্থানপরিবর্ত্তনের দ্বারা, খাঁটি accent-মূলক ছন্দের বৈচিত্র্য আমদানি করা সম্ভব হয় নাই; সত্যেন্দ্রনাথের Young Lochinvar-এর অনুকরণ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। বাংলার এই আদ্য-ঝোঁককে হঠাৎ একটু মাঝখানের দিকে আনিবার একমাত্র উপায়—চরণের আরম্ভ তাহার বাহিরে, কিছু ছন্দাতিরিক্ত অক্ষর বসাইয়া দেওয়া, যেমন—

(এল) উতল হাওয়া (ফুল) পুলক নিয়ে

(ক্ষীর) সাগর জলে (আলো) ঝলক দিয়ে! (সত্যেন্দ্রনাথ

—ইহার প্রত্যেক পংক্তিতে আসল পর্ব্ব আছে দুইটি—বন্ধনীর মধ্যে যাহা আছে, তাহা ছন্দাতিরিক্ত (Hypermetric)। তথাপি এই ওই Hypermetric-সহ প্রত্যেক চরণ দুইটি ধ্বনিভাগে ভাগ হইয়াছে এবং ঐ Hypermetric-এর জন্যই ঝোঁক আদিতে না পড়িয়া মধ্যে পড়িয়াছে।

ছড়ার ছন্দেও এইরূপ হয়, যথা—

(কোথাকার) ঢেউ লেগেছে

(আজি ঐ) গগন পরে,

(ধোঁয়াধার) সোঁত ভেঙেছে
মেঘের থরে। (সত্যেন্দ্রনাথ)

কিংবা—

(তুলে ঢেউ) গুপ্পগাথার / কুঞ্জে ঘোরে,

(মধু-বিষ) মিশিয়ে বিধি / গড়লে ওরে!

(জানে ও) হুল ফোটাতে,

(জানে ও) ভুল ছোটাতে,

(পারে ও) ফুল ফোটাতে / প্রাণের তারে / গমক হেনে। (সত্যেন্দ্রনাথ)

ছন্দাতিরিক্ত অংশগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়াছি—ওই অক্ষরগুলি যেন কোন রকমে পার হইয়া, আসল পর্ব্বের আদ্য অক্ষরে ধাক্কা দিতে হয়। এখানেও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই যে, ঐ ছন্দাতিরিক্ত অংশেরও একটা মাপ আছে; এল, ফুল, ক্ষীর, আলো—সাধুভাষার প্রকৃতি অনুসারে (কবিতাটির ছন্দ—পাঁচ মাত্রায় পর্ব্বভূমক) যেমন দুই মাত্রার, তেমনই, 'কোথাকার', 'আজি ঐ' এবং 'ধোঁয়াধার'-ও কথ্যভাষার প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেকটিই তিন অক্ষরের, ইহাতে হসন্তের হিসাব নাই। কিন্তু মাঝের ছোট পংক্তিগুলিতেই Hypermetric-এর ক্রিয়া স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 'জানে ও হুল্ ফোটাতে'—যেন একটি সাত অক্ষরের (syllable) টানা একই পর্ব্ব; ঝোঁকটি তাহার মধ্যস্থলে—ঠিক চতুর্থ স্থানে (৩—১—৩) পড়িয়াছে। এজন্য Hypermetric-এর

অক্ষর-সংখ্যার সঙ্গে মূল পর্ব্বের অক্ষর-সংখ্যার একটা যোগ আছে দেখা যায়—না থাকিলে ছন্দটি ভালরূপ বাজিবে না। এমনই করিয়া Hypermetric-এর সাহায্যে আদ্য-ঝোঁককে লঙ্ঘন করিয়া পর্ব্বের মধ্যস্থানে ঝোঁক দেওয়া যায়—আদ্য-ঝোঁক এখানে গৌণ হইয়া থাকে। বাংলা শব্দের আদ্য-ঝোঁককে আর কোন উপায়ে, এই সকল ছন্দে, হটাইয়া লওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ, এই ছড়ার ছন্দের পর্ব্বচ্ছেদ চার না ধরিয়া, তাহাকে যে তিনের ঘরানা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। ওই ঝোঁককে যদি দুই মাত্রার ওজন দেওয়া যায়, এবং প্রতি পর্ব্বের চারকে দুই ভাগ করিয়া প্রতি ভাগে একটি পৃথক ঝোঁকের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের ঐ মত ঠিকই। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যেমন সেই ছাঁদ রক্ষা করিয়াই কবিতা রচনা করিয়াছেন—চারের পর্ব্বকে দুইয়ে ভাঙ্গিয়াছেন, এবং প্রত্যেকটিতে পৃথক ঝোঁকের উপায় করিয়াছেন, যেমন—

দুর্দ্দম • তোমার / শৌর্য্যের • বরে,
—পর্ব্বত • দাঁড়ায় / গর্ব্বের • ভরে,

—তেমনই, এইরূপ কৌশল না করিলে ছড়ার ছন্দের পক্ষে এই চলন ও এই সুর স্বাভাবিক নয়; 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'কে—

বিষ্টি • পড়ে / টাপুর • টুপুর

এইরূপ করিয়া পড়িলে, তাহা স্বাভাবিক হয় না—ওইরূপ সুরে পড়া নিয়মও নয়। এখানে উহা স্পষ্টই চারের চাল, এবং আদ্য অক্ষরে একটা ঝোঁকই আছে। বরং, ইহাকে এইরূপ ত্রৈমাত্রিক-হিসাবে গণনা না

করিয়া, অনায়াসে দ্বৈমাত্রিকের হিসাবে লওয়া যায়—ঐ চার আসলে দুইয়েরই গুণিতক, যথা—

কৃষ্ণ-কলি • আমি-তারেই • বলি
* * *
যারা নিত্য-কেবল • ধেনু-চরায় • বংশী-বটের • তলে
(রবীন্দ্রনাথ)

—এ ছন্দে সর্ব্বত্র ঐ চারকে দুইয়ের ভাগে ভাগ হইতে দেখা যায়; কেবল, ঐ আদ্য-অক্ষরের ঝোঁকের জন্য প্রতি পর্ব্বের প্রথম খণ্ডে এমন একটা তিনের আমেজ থাকে যে, হঠাৎ পর্ব্বগুলিকে পর্ব্বভূমকের পাঁচ মাত্রার বলিয়া ধাঁধা লাগে। কিন্তু এ ভুলও চোখের ভুল—যেখানে ধ্বনিস্থান হসন্তসমেত পাঁচটা, এবং আদ্য অক্ষরের পরে হসন্ত বা যুক্ত বর্ণ থাকে, সেইখানেই এইরূপ মনে হয়; কিন্তু কান ঠিক থাকিলে, ঐ ঝোঁক এবং তজ্জনিত লয়ের পার্থক্য ধরা পড়িবেই। কারণ, পর্ব্বভূমক ছন্দে স্বরধ্বনিগুলি যেমন সজাগ, তেমনই, পর্ব্বের মাত্রা-গণিত কালের পরিমাণও বেশি।

৯

ছড়ার ছন্দ সম্বন্ধে ইহার অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'হসন্ত-প্রাণ মাত্রাবৃত্ত' সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। সত্যেন্দ্রনাথ এই হসন্তযুক্ত অক্ষরকেই (যথা—তুম্, দের্, সর্, নার্) গুরু, এবং সকল স্বরান্ত বর্ণকে (যথা—তা, কে, কি, প, স) লঘু ধরিয়া বাংলা কবিতায়, সংস্কৃতের অনুকরণে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা ছড়ার ছন্দ নয় বটে; তথাপি, কথ্য বাংলা-ভাষার উচ্চারণ বজায় রাখিয়াই—আমাদের কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতাকেই কাজে লাগাইয়া, তিনি এক নূতন ছন্দধ্বনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

ইহার ফলে, বাংলা কবিতায় যে অভিনব ধ্বনিবৈচিত্র্য ঘটিয়াছে, তাহা অতিশয় শ্রুতিসুখকর এবং শিল্পহিসাবে উপভোগ্যও বটে ; কিন্তু সে ছন্দ কৃত্রিম, তাহাতে খাঁটি কবিতা অপেক্ষা 'চিত্রকাব্য' রচনাই সম্ভব। কারণ, বাংলা বাক্যের উচ্চারণে, আদ্য-ঝোঁককে কোন ক্রমেই আর কোথাও সরাইয়া লওয়া যায় না ; এজন্য, গুরু-লঘু—স্বরসন্নিবেশকালে, সেই ঝোঁককে লঙ্ঘন করিয়া—ছন্দের আবশ্যকমত, যে কোন স্থানে স্বরবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে ছন্দের কারুকলা বা কৃত্রিম ধ্বনি-চাতুর্য্যই প্রধান হইয়া উঠে—কাব্যপ্রেরণার আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। তথাপি, সত্যেন্দ্রনাথ, বাঙালী কবির একটা বহুকালের আকাঙ্ক্ষা কতকটা সহজ উপায়ে মিটাইতে চাহিয়াছিলেন ; প্রাচীন কবিদের, সংস্কৃত-ছন্দে বাংলা কবিতা-রচনার কথা ছাড়িয়া দিলেও, আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষা যে প্রবল ছিল, তাহার প্রমাণ—

চরণ অরুণ বর্ণে লজ্জিছে রক্তপদ্মে,
কণিত কথনো তাহে স্বর্ণমঞ্জীর মঞ্জু। (বলদেব পালিত)

* * *

তথাপি তাহে হইয়া অতৃপ্ত
নিশীথিনী-কান্ত নিতান্ত ধৃষ্ট
সরোবরে শুভ্র করঃ প্রসারি
জাগাইছে সুপ্ত কুমুদ্বতীরে। (ঐ)

—দীর্ঘস্বরকে ও যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণকে 'গুরু' করিয়া পড়িলে বাংলায় এরূপ ছন্দ যে কিরূপ হাস্যকর হয়, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কিন্তু তথাপি, আমাদের কবিগণ নিরস্ত হন নাই। সত্যেন্দ্রনাথ, বাঙালী কবিগণের সেই পুরাতন পিপাসা—দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার মতই—মিটাইয়াছেন ; তিনি, দীর্ঘ-হ্রস্বের এইরূপ হাস্যকর প্রমাদ না ঘটাইয়া হসন্তবর্ণের সন্নিবেশ-কৌশলে, একরূপ গুরু-লঘু মাত্রাভেদ ঠিক করিয়া

লইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও, সংস্কৃত ছন্দের পদভাগ না মানিলে, এবং হসন্তপূর্ব্ব স্বরগুলিকে একটু সাবধানে উচ্চারণ না করিলে, ছন্দ বজায় রাখা যায় না—বাংলা স্বরে ও সুরে পড়িলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায় ; যথা—

ভরপুর অশ্রুর / বেদনাভারাতুর / মৌন কোন সুর / বাজায় মন

—ইহার পদভাগ যেমন বাংলা নয়, তেমনই সর্ব্বত্র হসন্তের পূর্ব্ববর্ণে স্বর-বৃদ্ধিও স্বাভাবিক হয় না—'ভারাতুর'-এর 'তুর'কে কিছুতেই দীর্ঘ করা যায় না। কিন্তু—

চপল পায় • কেবল ধাই,
কেবল গাই • পরীর গান।
পুলক মোর • সকল গায়,
বিভোল মোর • সকল প্রাণ। (সত্যেন্দ্রনাথ)

—এই পাঁচ মাত্রার ছন্দে, হসন্তের সংখ্যা ও স্থাননির্দ্দেশ নিয়মিত হওয়ায়, এমন একটি সুর বাজিয়াছে, যাহা সাধারণ পর্ব্বভূমকে নাই। তথাপি কবির অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই ; তিনি এখানে প্রত্যেক পর্ব্বের পাঁচ মাত্রাকে তিনটি অক্ষর ধরিয়া, এইরূপ গুরু-লঘু বিন্যাস করিতে চাহিয়াছেন—চপল্ পায় ; অর্থাৎ, প্রথমটি 'লঘু' ও পরের দুইটি 'গুরু'—এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হয় নাই—প্রতি পর্ব্বের প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়িবেই, এবং সে ঝোঁক ঐ অন্তস্থিত হসন্তের জন্য আর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে ; ওই আদ্য-ঝোঁকই এইরূপ সকল চেষ্টা মাটি করিয়া দেয়। তথাপি ঐ পর্ব্বগুলি, তিন ও দুইয়ের ভাগ হওয়ায়, এবং ঠিক ঐ সকল স্থানে হসন্তবর্ণের সন্নিবেশ থাকায়, প্রতি পর্ব্বে যেমন দুইটি করিয়া ঝোঁক মিলিয়াছে, তেমনই হসন্তপূর্ব্ব স্বরধ্বনিগুলির একটি লঘু ললিত প্রয়াণ-ভঙ্গিও উহাতে সম্ভব হইয়াছে—সে যেন সত্যই

—'vowels that elope with ease'। পংক্তিগুলির ছন্দচিত্র কতকটা এইরূপ—

চ পি-ল্ পা-য় / কে ব-ল্ ধা-ই

কে ব-ল্ গা-ই / পল্লী-র গা-ন

—ইত্যাদি।

আবার—

উদ্দাম • সাগর / মন্থন • করো,

আত্মের • বরুণ / ছত্তর • ধরো,

সিংহল • শ্রীভোজ / নাথদ্বীপ • ভরো,

—জয়! জয়! (সত্যেন্দ্রনাথ)

—এখানে চারের চাল দুইয়ে ভাগ হইয়া গিয়াছে—প্রত্যেক ভাগের আদ্য-ঝোঁক রীতিমত stress বা 'ঠেস্' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানেও প্রত্যেক অর্দ্ধপর্ব্বের অন্ত্য হসন্তবর্ণ আদ্য-ঝোঁকেরই বৃদ্ধিসাধন করিতেছে। তা ছাড়া, আরও একটি কৌশল ইহাতে আছে—প্রত্যেক পর্ব্বের প্রথম ভাগের আদ্য-অক্ষরের পরে একটি করিয়া যুক্তাক্ষর আছে, দ্বিতীয় ভাগটিতে তাহা নাই; তাহার ফলে, ঝোঁকের বেশ তারতম্য ঘটিয়াছে—একটি ঝোঁক বড়, একটি ঝোঁক ছোট; এবং এই বড়-ছোট ঝোঁক পর-পর সাজানো আছে বলিয়া একটি চমৎকার ছন্দসঙ্গীত সৃষ্টি হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ এই ছন্দ সংস্কৃত ছালিক্যছন্দের অনুকরণে রচনা করিয়াছেন; অনুকরণ যেমনই হউক—ছন্দটি সুন্দর এবং তাহা বাংলা হইয়াছে।

পর্ব্বভূমক ছন্দেও—মাত্রার কেবল পরিমাণ রাখিয়া নয়—গুরু-লঘু ভেদ করিয়া, একটু ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা যায়, যথা—

দ্বৈমাত্রিক—

ভোমরায় • গান গায় • চরকায় • শোন্ ভাই। (সত্যেন্দ্রনাথ)

কিংবা

পাঁড়ময় • ঝোপঝাড়

জঙ্গল • জঞ্জাল,

জলময় • শৈবাল

পান্নার • টাঁকশাল —(ঐ)

ত্রৈমাত্রিক—

ওই চন্দন যার • অঙ্গের বাস • তাম্বুল-বন • কেশ (ঐ)

কিংবা—

ওগো আলতায় লাল • পায় তল যার • মঞ্জীর তার • রাজবেই (করুণানিধান)

[এখানে দ্বৈমাত্রিক পর্ব্বের চারিটি মাত্রা দুইটি ডবল-মাত্রা, বা গুরুমাত্রায় পরিণত হইয়াছে; প্রতি অক্ষরে একটি করিয়া হসন্ত যুক্ত থাকায় এইরূপ হইতে পারিয়াছে; যথা—'ভোম্ রায় / গান্-গায়' ইত্যাদি। ত্রৈমাত্রিকেরও ছয়মাত্রা, ঐ একই কারণে, তিনটি সমান গুরু-মাত্রায় পরিণত হইয়াছে।]

সত্যেন্দ্রনাথ এই হসন্ত-জনিত লঘু-গুরু ভেদকে, অধিকতর দুঃসাহসের সহিত, রীতিমত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-রচনার কাজে লাগাইয়াছিলেন, তাহাতে সর্ব্বত্র সফল না হইলেও কোন কোন রচনায় প্রায় সফল হইয়াছিলেন—অন্তত পাঠকালে মনে হয়, এমন ছন্দকে সহজ বাংলা উচ্চারণের ভঙ্গিতে ধরা যায়, এবং সেইরূপ ভঙ্গিতে ঐ ছন্দের মাত্রাবিধি খুব নিখুঁতভাবে পালন না করিলেও চলে। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিকে সাধারণ পর্ব্বভূমক ছন্দ অনুযায়ী এইরূপ বিশ্লেষ করা যায়—

সারা-নিশি-ভরা • যন্ত্রণার

দুঃস্বপন • টুটল মোর,

অশ্রু আর • দুর্দ্দশার

হয়রে শেষ • হয়রে ভোর।

—ইহার প্রথম পংক্তিতে দুইটি অসম পর্ব্ব আছে—৬ মাত্রার, ৩ মাত্রার; বাকিগুলি সব ৫ মাত্রার পর্ব্ব। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, উহার ধ্বনি-প্রবাহ সাধারণ পর্ব্বভূমক হইতে স্বতন্ত্র; প্রথম ছয় মাত্রার পর্ব্বটি (ইহাতে একটিও যুক্তাক্ষর বা হসন্তবর্ণ নাই) এক ঝোঁকে পড়িবার পর যে দুইটি ধাক্কা পাওয়া যায়, এবং তাহাদের স্থান যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, পর্ব্বভূমক ছন্দে সেরূপ ব্যবস্থা নাই। এই ব্যবস্থার ফলে এ ছন্দের রূপ স্বতন্ত্র, যথা—

(সায়ানিশিভরা) য́ন্-ত্রঁ-ণা́র্

ঝ́স্-সঁ-প́ন্ • টু́ট্-লঁ-মো́র্—ইত্যাদি

দেখা যাইতেছে, ছন্দের প্রথম ছয় মাত্রার কোথাও ঝোঁক বা মাত্রার গুরুত্ব নাই, পরের সকল পর্ব্বেরই পাঁচ মাত্রা তিনটি অক্ষরে পরিণত হইয়াছে; এই তিনের প্রথম ও শেষ অক্ষর গুরু, এবং মাঝের অক্ষর লঘু; ('লঘু'র মাথায় একটি ০-চিহ্ন দিয়াছি)। এমনই করিয়া পর্ব্বভূমক গীতিচ্ছন্দকে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রীতিমত অক্ষর-মাত্রিক ছন্দে পরিণত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ যে ছন্দসঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হয় নাই। এই গুরু অক্ষরের উপরে যে জোর পড়িতেছে, তাহা দুই রকমের হইতে পারে—(১) অক্ষরের স্বরধ্বনির প্রসারণ-মূলক, অথবা (২) ছড়ার ছন্দের মত, স্বরবিস্ফোরণ-মূলক। প্রথমোক্ত ভঙ্গিতে পড়িলে, মাত্রার গুরু-লঘু ভেদের মর্য্যাদা বজায় থাকে, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা স্বাভাবিক শোনায় না; শেষোক্ত ভঙ্গিতে পড়িলে, হসন্তের পুরা দাম আদায় করা যায় বটে, এবং উচ্চারণেও কৃত্রিমতা থাকে না, কিন্তু তাহাতে এইরূপ নিয়মিত ও ঘন ঘন ঝোঁক দেওয়ার ফলে, ছন্দধ্বনি যন্ত্রবৎ শুনিতে হয়; তাহার জন্য

কবিতা ক্ষুণ্ণ হয়। এই জন্যই আমি সত্যেন্দ্রনাথের এই নূতন ছন্দ-পদ্ধতির কলাকৌশল স্বীকার করিলেও, তাহার পূর্ণ সার্থকতা স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করি। এই ছন্দে, পর্ব্বভূমকেরই এক এক পংক্তি বেশ লীলায়িত হইতে পারে—মাঝে মাঝে এমন পংক্তি—

উড়ে চলে গেছে বুলবুল,
শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর।

অথবা, যেমন এই কবিতায়—

একাকী আছিনু মুহ্যমান
*　　*　　*
আহা! ওরে বাছা! মোর দুলাল

—বেশ খাপ খায় বটে, কিন্তু ওই নিয়মেই ছোট ছোট পর্ব্বগুলির পুনরাবৃত্তি অতিশয় কৃত্রিম হইয়া উঠে। তা ছাড়া, সংস্কৃত ছন্দের মত পদভাগ আমাদের বাক্-প্রকৃতির অনুগত নয়।

ছড়ার ছন্দের সেই হসন্তকে একটা বিশিষ্ট ওজন দিয়া, এবং এইরূপ হসন্তযুক্ত অক্ষরের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দেই সংস্কৃত ছন্দের ঠাট যেটুকু আমদানি করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমি তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

১০

বাংলা ছন্দের একটা মোটামুটি পরিচয় দিলাম। এই পরিচয় মুখ্যত বাংলা কবিতা-পাঠের জন্য—ছন্দের তত্ত্বব্যাখ্যা আমার উদ্দেশ্য নয়। তথাপি, আমাকে মাঝে মাঝে যে ধরনের তত্ত্ব বিচার করিতে হইয়াছে, তাহা আসলে বাংলা ছন্দের রূপভেদ বুঝাইবার জন্য, এবং তাহাতে, কবিতা-পাঠের যে ভঙ্গি বা ছন্দ-অনুসরণ-মূলক উচ্চারণ—তাহাকেই ভিত্তি করিয়া, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় কয়েকটি নিয়ম নিরূপণ

করিয়াছি। বাংলা ছন্দের যে তিনটি ঠাট এক্ষণে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে বাংলা কাব্যে তাহার বীজ মাত্র ছিল, অর্থাৎ তাহাদের কোনওরূপ পৃথক হিসাব ছিল না; সকল হিসাবই এক হিসাবের—পয়ারের—অধীন ছিল; কবিদের কেবল এই বোধ মাত্র ছিল যে, ছন্দ-রচনায় একটু মাত্রা-জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। এই মাত্রা-জ্ঞানও খুব স্থূল রকমের ছিল—কারণ, কান ছাড়া আর কোন প্রমাণ না থাকায়, এবং সুর করিয়া পাঠ করার জন্য, কানকে আবশ্যকমত 'সুর ঠারিয়া', অর্থাৎ মাত্রা-পরিমাণের ফাঁকিগুলি, পড়িবার সময়ে সুরে সারিয়া লইয়া, কবিতার ছন্দ বজায় রাখা হইত। অধুনাতন কাব্যে পয়ারের যে রূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সুরের অবকাশ নাই; তাহার উপর, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আধাররূপে, যতি ও স্বরবৃদ্ধির (accent) নূতনতর বিন্যাস-বিধির ফলে, একটা সম্পূর্ণ নূতন ছন্দধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছে—সাধারণ পয়ার বা পদভূমক ছন্দ উৎকৃষ্ট কাব্যচ্ছন্দে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সাধুভাষার মাত্রিক ছন্দকেই একটা নূতন ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন—যুক্তাক্ষরঘটিত ডবল-মাত্রাকে গণনীয় করিয়া, তিনিই পর্ব্ব-ভূমক ছন্দের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাংলা কাব্যে এই ছন্দের প্রাচীন প্রয়োগ বা ইতিহাস আমি এখানে বিবৃত করিব না; কেবল বৈষ্ণব-পদাবলীর ব্রজবুলির উচ্চারণে, আবশ্যকমত স্বরমাত্রা দীর্ঘ করিয়া, যে ছন্দের একটি ঠাট দেখা দিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিব, যথা—

রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন—

কিংবা—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু,
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা।

ইহাদের প্রথমটিকে খাঁটি বাংলা দ্বৈমাত্রিক পর্ব্বভূমকের চার-মাত্রার হিসাবে ধরা যায়—হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ না করিলেও চলে, যথা—

রজনী শা • ঙন ঘন / ঘন দেয়া • গরজন

কিন্তু দ্বিতীয়টির মাত্রাগুলি সমান নয়—হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে, যথা—

আজু র • জনী হাম / ভাগে পো • হাইনু

পেখনু • পিয়ামুখ • চন্দা

এখানে স্থানবিশেষের মাত্রাকে দুই মাত্রা ধরিলে প্রত্যেক পর্ব্ব চার মাত্রার, শেষে একটি তিন মাত্রার খণ্ডপর্ব্ব আছে। খাঁটি বাংলা ছন্দে ঐ হ্রস্ব-দীর্ঘের স্থানে কেবল যুক্তাক্ষরের সাহায্য লইলেই, মাত্রার একটা গুণ-ভেদ করিয়া ছন্দ-রচনা করা যায়; এইরূপ ছন্দ-রচনার ঝোঁক প্রাচীন কবিতার বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু এই রীতিকে সজ্ঞানে বিধিবদ্ধ-ভাবে অবলম্বন করা হয় নাই—সর্ব্বত্র, ঐ সঙ্গে হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রতি একটা অবুঝ আসক্তিই সেই কৌশল ব্যর্থ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই উদ্ধার করিয়া এই নূতন ছন্দটি বাঙালী কবিকে দান করিয়াছেন।

ছড়ার ছন্দের পরিচয়ও কিঞ্চিৎ দিয়াছি, ইহার মূলে আছে হসন্তের উপদ্রব। কথ্য ভাষার উচ্চারণ-ভঙ্গিতে যে ছন্দ সম্ভব, তাহাতেই ছড়ার ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে—সেই উচ্চারণে মাত্রার পরিমাণ অগ্রাহ্য করা চলে। এই হসন্ত-বর্ণগুলিকে প্রয়োজনমত মাত্রার মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া, অথবা স্বর-মাত্রাকে একটু টানিয়া হসন্তের দ্বারা মাত্রাপূরণ করা সম্ভব বলিয়া—স্বরধ্বনি ও হসন্তধ্বনি, এই দুইয়ের একটা খিচুড়ি পয়ার বা পদভূমক ছন্দে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। একটা সামান্য উদাহরণ দিতেছি—

পরের সোনা / না দিও কানে।
প্রাণ যাবে তোর / হেঁচকা টানে।

—ইহাতে দুইটি করিয়া পদভাগ আছে; কিন্তু দ্বিতীয় চরণে এই ছন্দের রূপ যেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, প্রথমটিতে তাহা হয় নাই। ইহার প্রতি চরণ

১১ অক্ষরের, পদভাগ যথাক্রমে ৬+৫। পাঁচের চেহারাটি প্রথম চরণে, ও ছয়ের চেহারা দ্বিতীয় চরণে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ, প্রথম চরণের ছয় মাত্রার পদে, ও দ্বিতীয় চরণের পাঁচ মাত্রার পদে মাত্রাপূরণ হয় নাই —চল্‌তি ভাষার হসন্তের দোলা দিয়া কানকে তুষ্ট করা হইয়াছে। যদি প্রত্যেক পদকে চারিটি অক্ষরের (syllable) পর্ব্ব ধরিয়া ছন্দ ঠিক করা হয়, তাহা হইলেও বাধা আছে—প্রধান বাধা, ইহাতে ছড়ার ছন্দের মত সেই উচ্চারণের ধাক্কা নাই; বরং, প্রত্যেক পদকে চার মাত্রার ধরিয়া হসন্তগুলাকে কোন রকমে সেই মাত্রাগুলির মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া যায়। বরাবর উচ্চারণের এই দোটানার জন্য, বাঙালী কবির পক্ষে ছন্দের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই; তাহার একটা বড় কারণও এই যে, সেই সকল কবিদের কাব্যসংস্কারে গ্রাম্যতা-দোষ ঘুচে নাই; অনেক পরে ভারতচন্দ্রে আসিয়া বাংলা কবিতা, ভাষায় ও ছন্দে, নাগরিকসুলভ রুচির পরিচয় দিয়াছিল।

কিন্তু বাংলা ছন্দের এই সকল অনিয়ম ও অপরিচ্ছন্নতাকেই তাহার মূল প্রকৃতির লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, যাঁহারা ওই দুই ধ্বনি-প্রকৃতির দুই ভাষা, ও ছন্দের তিন ঠাটকেই এক গাড়ে ঠেলিয়া দিয়া, বাংলা ছন্দের মূলসূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হইতে চান, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিলেও বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। ইঁহাদেরই একজন 'Bar and Beat' নামক একটি 'থিয়রি'র সাহায্যে সর্ব্বসমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে এই 'Bar and Beat'-এর যে ব্যাখ্যা দেখিয়াছি তাহা অতিশয় মনোরম হইলেও, তিনি বাংলা ছন্দের যে বিভিন্ন ঠাট-নির্দ্দেশ ও তাহার বহুল বিশ্লেষণ যে ভঙ্গিতে করিয়াছেন, এবং সেই সকল ঠাটের যে পারিভাষিক নামকরণও

করিয়াছেন—তাহাতে 'Bar and Beat'-এর দোহাই যে কেমন করিয়া দেওয়া চলে, সে যুক্তি সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রথমেই, ইংরেজী ছন্দশাস্ত্র অনুসারে (কারণ এই 'থিয়রি'টি আদৌ নূতন বা মৌলিক নয়) এই 'Bar and Beat'-এর একটা সহজ অর্থ দিতেছি। যেখানে পদ্যের পদ-পদ্ধতিতে কোন নির্দ্দিষ্ট মাত্রার পদ-বিভাগ (foot) নাই, এবং মাত্রার পরিবর্ত্তে অক্ষরের (syllable) স্বরবৃদ্ধি (accent)-ই গণনীয়, সেখানে এক বা একাধিক accent তদাশ্রিত ধ্বনিপর্ব্বকে (sound group) যে ভাবে পৃথক করিয়া লয়, সেই পৃথক অংশগুলি এক একটি foot-এর কাজ করিয়া থাকে; এইরূপ foot-কে Bar বলে, এবং ঐ accent বা স্বরবৃদ্ধিই তাহার Beat। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে—Irregular, অর্থাৎ অনিয়মিত ছন্দেই এই 'Bar and Beat' থিয়রি প্রযোজ্য। বাংলা ছন্দের যে প্রকৃতি, এবং তাহার ঠাটগুলির যে ব্যাখ্যা ও পরিচয় আমি এ পর্য্যন্ত করিয়াছি, তাহাতে, এই 'সর্ব্বংখল্বিদং ছন্দে'র মত ছন্দ-তত্ত্বের শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন নাই; কারণ, বাংলা ভাষার আদিম বা মূল প্রকৃতি যেমনই হউক, তাহার ধ্বনিরূপের ভেদসত্ত্বেও, সর্ব্বত্র ছন্দের একটা রীতিমত হিসাব সম্ভব। এক হিসাব আর এক হিসাবের সঙ্গে মেলে না বলিয়া, এবং যেমন করিয়া হউক মিলাইতেই হইবে বলিয়া, আধুনিক ও প্রাচীন বাংলা কবিতায় যত কুশ্রী ও ছন্দোদোষদুষ্ট পংক্তি আছে সেই সকলকে উদ্ধৃত এবং প্রামাণ্য করিয়া, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও ধ্বনি-বিজ্ঞান-রসিকদিগের প্রাণ তৃপ্ত করিবার জন্য, বাংলা ছন্দের মূলসূত্ররূপে এই 'Bar and Beat'-তত্ত্বকে 'দণ্ড ও আঘাতে'র মত আস্ফালন করিবার কোন হেতু নাই। আমরা দেখিয়াছি, পয়ার বা পদভূমক ছন্দের পদ-পদ্ধতিতে মাত্রা-গণনার উপায় আছে; পর্ব্বভূমক ছন্দে এই মাত্রার গণনা আরও হিসাবসম্মত;

এবং ছড়ার ছন্দে, চোখ বুজিয়া—কেবল যেন আঙুলের সাহায্যে—পর্ব্বগুলির আয়তন নির্ণয় করা যায়। বাংলা ভাষায় ছন্দের দুই জাতি কেন হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি; ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি অনুসারে ছন্দের প্রকৃতিভেদ অবশ্যম্ভাবী। সাধুভাষার ছন্দেরও যে দুইটি ঠাট দাঁড়াইয়াছে (পদভূমক ও পর্ব্বভূমক), তাহারও মূলে এক তত্ত্বই আছে। অতএব সবগুলিকে জোর করিয়া এক ছন্দ-পদ্ধতির অধীন করিবার জন্য, একটা বড় সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তাহারই সমাধানের বাহাদুরি—বাহাদুরি মাত্র; তাহাতে বাংলা ছন্দতত্ত্বের কোন উপকার হইবে না। Beat বা প্রবল ঠেস—কথ্য বাংলায় সম্ভব হইলেও, আমরা দেখিয়াছি, ওই ঠেস সর্ব্বত্র আদিতে পড়িয়া থাকে, এবং তাহারই টানে পর্ব্ব বা পদের যে বিশ্লেষ ঘটে, তাহাও স্বাভাবিক; কিন্তু তাহার উপরে ছন্দ নির্ভর করে না, ইহাও সত্য; কেবল ঝোঁকের সংখ্যা বাড়ে বা কমে। বাংলা ছন্দে 'Bar and Beat'-এর আভাস যেখানে যেটুকু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয়, তাহারও দৃষ্টান্ত দিতেছি; যথা—

(১) কালি কালো মিশি কালো / অমাবস্যার নিশি কালো /
গদাধরের পিসি কালো,
কিন্তু, জানো না / কি কালো / সেই কালো রঙ! (দ্বিজেন্দ্রলাল)

কিংবা

(২) যদি জানতে চান / আমি ঠিক কি রকম / স্ত্রী চাই—
ফর্সা / কি কালো / কি মাঝারি রঙ,
লম্বা / কি বেঁটে / কি ক্ষীণা / পীনা
দেখতে ঠিক পরী / কি দেখতে ঠিক সং (ঐ)

—প্রথমটিতে Hypermetric বাদ দিয়া একটা পর্ব্ব-পরিমাণের হিসাব হয়তো পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টিতে তাহাও সম্ভব নয়; অতএব এই দ্বিতীয়টিতেই, বাংলা ছন্দের 'Bar and Beat'-লক্ষণ আছে। কিন্তু এই ছন্দ কি বাংলা কাব্যের ছন্দ হইতে পারিয়াছে? Hypermetric বাদ দিয়া, এবং যুক্ত বা হসন্ত বর্ণের হিসাব কোন রকমে মিটাইয়া, ইহাকেও, কোন একটা রীতিমত ছন্দে দাঁড় করাইতে পারিলেও—ইহা সাধারণ বাংলা কাব্যচ্ছন্দ নয়, একরূপ গদ্যচ্ছন্দ বলিলেও চলে। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন বা অবকাশ আমার নাই; আমি কেবল এই অভিনব আবিষ্কারের একটু পরিচয় দিলাম মাত্র। এইবার আমি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা বলিব।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ভ্রষ্টা

ওগো, ছন্দ-সরস্বতী,
কাব্য তোমার পরম গুরু,
তাই কি তুমি সতী,
মনের মানুষ ধ্বনির সাথে ছোটো উধাও হয়ে
উপলমুখর পথে যেমন ঝরনা আসে ব'য়ে
অহর্নিশি ভাবছ, চরণ পড়ছে তালে লয়ে?
থামছ যেথায় যতি?
ওগো কাব্য-সীমন্তিনী,
সিঁথির সিঁদুর হতে বড়
নূপুর-শিঞ্জিনী?
হাতের নোয়া থাকলে তোমার থাকবে অলঙ্কার।
সতীর পদে এই মিনতি জানাই বারংবার—
রূপ-চটকে দুদিন শুধু ভোলে যে সংসার
ফুরায় বিকিকিনি।

চলচ্চিত্র

পা-হি-স্থান।

জিনিয়াস জিন্-নার পরিকল্পনা

আদালতী হক

খুব টাটকা ছানা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট যে কি ছিল, ইউ. পি-তে তোমাদের ধারণা নেই। জণ্টসাব। এ ম্যাজিষ্ট্রেট নয়—এরা জণ্ট্। উপরওয়ালাকে সামান্য একটু মানত বুড়ো বাপের মত, তা ছাড়া, এই জণ্টই হল জঙ্গিলাট, হোয়াইট-হল, গবর্মেণ্ট। সেই হেন জণ্ট্ নিয়ে চিরটাকাল কাজ চালিয়ে এলুম দাদা, আর আজ কংগ্রেস কংগ্রেস ক'রে আমাদের কাছে চালাকি মারতে এসো না। আমরা পুরোনো ঘোড়ার সওয়ার, অত সহজে পড়ি না। সাদা খদ্দরের গান্ধী টোপি প'রে যে এত তাড়াতাড়ি আমার ধাত বদলিয়ে দেবে, এ হবার নয়। আজকে এজলাসে ঢুকে জণ্টের সামনে দাঁড়াতে পেরেছ, কিন্তু আমরা পেশকার যে কি চীজ সে এখনও বুঝতে তোমাদের অনেক দেরি। আমরা দেশী ট্রাট্। বাবাজী, এ জগৎটা সোজা নয়। বাইরের শত্রু মারতে পার, ঘরের শত্রু শক্ত মারা। আমাকে পূজো না দিয়ে যে চাতালে উঠে নিজের কাজ হাসিল করবে, তা চলবে না। সিক্কা ছাড়া কাজ হাসিল হয় না। তোমরা ছেলেমানুষ, অল্পেতে রক্ত গরম হয়ে ওঠে; মেজাজ ঠাণ্ডা ক'রে নরম হয়ে ভেবে দেখ, সোনাতে পান দিতে হয়, রুটিতে খামিরা দিতে হয়, পোলাওয়ে জাফরানটা দিতে হয়।

অত চ'ট না, চোখ লাল ক'র না। ব'স বাবাজি, ব'স। অনেকদিন আগেকার কথা একটা তোমায় বলি। কথাটা তোমার চোখে আতরের মত লেগে থাকবে।

বাপু হে, ঘুষ কখনও বন্ধ হয় না। ওটা আমাদের ন্যায্য পাওনা—হক। বিশ বছর আগে স্বয়ং এই এজলাসের মালিক হত্তাকত্তা বিধাতা

জন্ট সাহেব একদিন ঘুষ বন্ধ করতে গিয়েছিলেন, তোমরা তো কোন্ ছার!

আরে মশাই, সে কি বিপদ! তার হুকুম অমান্য করে ঘাড়ে কার এমন রক্ত আছে! আচিনস সাহেব এ দেশের পাস-করা জয়েণ্ট নয়, সে খাস বিলিতী জয়েণ্ট, যার সামনে ডিপ্‌টিরা কাঁপত, কোতোয়াল ঘামত, চাবুকের চোটে কথা শুনত ইন্‌স্পেক্টররা। সেই হেন জাঁদরেল যা পারল না, আজ এসেছ গান্ধী টোপি এঁটে তুমি তাই আমাকে পারাতে! সোজা উপদেশ দিচ্ছি, জেনে রাখ, ঘুষ কখনও বন্ধ হয় না।

সেদিন এজলাসে এসে আচিনস সাহেব টেবিল চাপড়িয়ে হুকুম দিলেন, আমরা যেন পকেটে পয়সা নিয়ে না আসি। থাকলে কৈফিয়ৎ দিয়ে কাজে বসতে হবে। রিশওয়াৎ বন্ধ্।

রিশওয়াৎ বন্ধ্ তো বন্ধ্। কিন্তু তাতে আমাদের কি! হক তো ছাড়া যায় না। খাব কি? ত্রিশ টাকা মাইনে। কাছারির পেশকার আমি, বাড়িতে হোলি-দেওয়ালি আছে, পাঁচটা রইস আমার এখানে এসে বসে, সাহেবের কানে কথা বলতে হ'লে আমি ছাড়া আর কাকেই বা তারা বলবে, দুঃখু জানাবে! এই শর্ম্মাই তো সাহেবের কান জলটা-আসটা খাওয়াতে হয়, খাতির তোয়াজ্জো করতে হয়। সে কি আর ত্রিশ টাকায় হয় বাপু! অথচ সাহেবের হুকুম, অমান্য করে কার ঘাড়ে দুটো মাথা! ভাবতে ভাবতে বাড়ি এলুম।

ভেবে কিছু পেলুম না।

তার পরের দিন, যাই হোক, পকেটে কিছু রাখলুম না।

যা করবেন ভগবান—এই মনে ক'রে ফেল্টের দোপাল্লিটা মাথায় এঁটে পুরোনো আচকানটা গায়ে টেনে ঘরের এক্কায় খুটখুট ক'রে গিয়ে কাছারিতে হাজির হলুম। নিজের জায়গাটিতে উঠে ডায়াসের উপর

বাক্সটি খুলে নথি নিয়ে বসলুম। চশমার ফাঁক দিয়ে দেখি, 'আমলাদের মুখ চুন, কুলকিনারা করতে পারে নি। ইস্তক, সাহেবের পেয়ারের খাসবাংলার আরদালী আবদুল গণি, আমাদের শিক্ষাগুরু, তারও দাড়ির মেহেদির রঙে যেন একটু ফ্যাকাশে প'ড়ে গেছে। আচিনস সাহেব এলেন, সওয়ালখানি সুরু হ'ল। সাহেবের মুখ দেখি আর ভড়কে যাই। কোন্‌টাই বা আগে দি, কোন্‌টাই বা পরে দি! টাকা আর হাতে আসে না। চারদিকে ঘুরছে সাহেবের চোখ, যেন শিকার খুঁজছে একটা বাঘ। কি করি! চল্লিশ-পঞ্চাশখানা সওয়ালখানির উপর হুসহুস ক'রে হুকুম হয়ে গেল। চাঁদির দরিয়া খামাকা বহে যাচ্ছে, অথচ নিতে পারছি না। মনটা মসমস করতে লাগল। হঠাৎ আর থাকতে পারলুম না; দেখি বাঁ হাতটা যেন আমাকে না জানিয়েই চিরকালের অভ্যাস-মত একটা টাকা নিয়ে ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন উঠল, দরওজা বন্ধ্ করো, তল্লাসি হোগা। মোকদ্দমা বন্ধ হয়ে গেল, হুলস্থুল কাণ্ড, সাহেবের হুকুমে আরদালী দৌড়ল, ইন্‌স্পেক্টর এলেন, সাক্ষী এল, চাপরাসীরা ঘিরে দাঁড়াল; সাহেব ডায়াস থেকে নেমে পেণ্টুলুনের পকেটে হাত দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালেন। শুধু গণি মিঞার মুখে দেখি একটু কেমনধারা ভাব—আমার যদি পাক্কা সাগরেদ হও তো বেরিয়ে যাবে।

ইশারা পেয়েই আমার শরীরটা ডায়াস থেকে নীচে নেমে এসে দাঁড়াল। দুজন পুলিস আমাকে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলে। আচকান, টুপি, জুতোর ভিতর খুঁজে দেখতে লাগল; টাকাটা কোথায়? মুখে আঙুল দিয়ে হাঁ করিয়ে দেখলে, টাকা নেই। দরি উঠাও, দিরাজ খোলো, টেবুলকা কাপড়া ঝাড়ো, বাকস দেখো—টাকা নেই। ঘরের আনাচে কানাচে খোঁজ হ'ল, নেই টাকা। জানলার বাইরের মাঠে খোঁজ চলল,

যদি উড়ে গিয়ে প'ড়ে থাকে। টাকা নেই, পাওয়া গেল না। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। গণি মিঞার চোখে—সাবাস, নাকে দীর্ঘনিশ্বাস, দাড়ির মেহেদি যেন বললে—ইজ্জৎ রইল।

আচিনস সাহেব পকেট থেকে হাত বের ক'রে এজলাসে উঠে বসলেন। গম্ভীর মুখ, বললেন, দরোয়াজা খোলো, পেশী হোয়।

বাইরের ঝড় থামল, কিন্তু আমার ভিতরে তখন ঝড় বইছে। পেশকারের গদিতে ব'সে এত বড় অপমান কখনও সই নি। কি করি। ডায়াসে উঠে হুজুরের সামনে মোকদ্দমার কাগজ পেশ ক'রে দুখানা ফুলস্ক্যাপ টেনে নিয়ে দরখাস্ত লিখলুম ডিভিসানাল কমিশনারের নামে। কড়া ক'রে দরখাস্ত লিখলুম, জানালুম—এতদিনকার পুরোনো খয়ের-খা নিমকহালাল তাঁবেদারের অদৃষ্টে কি শেষ পর্য্যন্ত এই ছিল! হুজুর, আল্লা-তালা মালিক, এর একটা বিচার হোক, বিনা কসুরে এত বড় অপমান হয়ে গেছে। পেশকারের গদিতে ব'সে থাকলে লোকে আর মানবে না।

মোকদ্দমা শেষ হতেই মাথা নীচু ক'রে আচিনস সাহেবের সামনে আমার দরখাস্ত পেশ করলুম,—যেন তিনি নিজের মন্তব্য দিয়ে উপরওয়ালার কাছে ফারওয়ার্ড ক'রে দেন। দেখলুম, আচিনস সাহেব চোখ না তুলেই কাগজচাপা দিয়ে দরখাস্তখানি চেপে রাখলেন। অন্য মোকদ্দমা সুরু হ'ল।

পেশকারের গদিতে ব'সে আমি মনে মনে বললুম,—বেশ, কাগজ-চাপাই দাও, পাথর চাপাই দাও, দেরাজের মধ্যেই পোর, আর বাক্স বন্ধ ক'রেই নিয়ে যাও, এ বাবা গভর্মেণ্টের রাজত্ব, চেপে রাখতে কি পারবে না। বের করতেই হবে।

গণির দিকে চেয়ে বুকে বল পেলুম, যেন সে বলছে, ঠিক করেছ খুবলালজী। এখন ঠেলাটি বুঝবে।

চারটে বাজল, এজলাস শেষ হ'ল, আহ্লমদ, উকিল, মোক্তাররা গুটি-গুটি বাড়ি গেল। বাইরে চেয়ে দেখি, নিমগাছের নীচে একটু ভিড় জমেছে। বুঝলুম আমারই অপেক্ষায়।

সাহেব আর ওঠেন না। খাড়া দাঁড়িয়ে আছে পিছনে গণি মিঞা, হাতের তেলো তার শুকনো, মনমরা। আমার মনের ভিতরটা একটা আতঙ্কে তমতম করছে। আমি নিয়ে ঘরে এই তিনজন, আর কেউ নেই। সাহেব আর ওঠেন না। দরখাস্তটা কাগজচাপা থেকে বার ক'রে দুচার লাইন প'ড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। মর্ম্মটা ঠিক বুঝেছেন। মুখের ভাবটা এমনই যেন এসব তো বুঝলুম, এখন বলতে পার টাকাটি কোথায় রেখেছ? আমা হেন ছুঁদে জয়েণ্ট সাহেব, তাকেও কাত করতে চাও! ঠোঁটে একটু হাসির রেখা টেনে বললেন, খুবলাল, দরখাস্ত তো দেখছি, এসব যা হবার সে তো হবেই। কিন্তু হাতে তোমার টাকা দেখলুম, রাখলে কোথায়? টাকা তো আর কর্পূর নয়।

আমি জোড়হাত ক'রে হুজুরে বললুম, আজ আমার মান ইজ্জৎ সমস্ত গেছে। আমি টাকা নিই নি। আজ নয়, জীবনে কখনও পানপাত্তার জন্যে একটি কানাকড়িও নিই নি। এখন আমারই মত একজন গরিব হুজুরের কুনজরে পড়ল?

সাহেব দোয়াতদান থেকে কলমটা তুলে নিয়ে চেয়ারে পিঠ লাগিয়ে আঙুলের মধ্যে কলমটা দোলাতে দোলাতে আমার চোখে চোখ রেখে হেসে বললেন, এদিকে এস খুবলাল।

আমি এগিয়ে গেলুম, আবার কি নতুন বিপদ! যাক, ঈশ্বর তুমিই মালিক।

আচিনস সাহেব অতি ধীরে ধীরে বললেন, ভয় নেই। আমি ইংরেজ, জবান দিলুম—তোমার অনিষ্ট হবে না।

অভিনয় করছেন কিনা বুঝতে পারলুম না ; কিন্তু দেখতে পেলুম, সেই মুহূর্ত্তে যেন চোখের ভিতরকার বাঘটা আর নেই। বললেন, খুবলাল, আমায় বলতেই হবে, টাকাটা কোথায় রেখেছ।

গণি মিঞার দিকে চাইলুম। সাহেব তখনই চমকে উঠলেন, পিছন ফিরে দেখলেন, গণি মিঞা ছবির মত দেয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে। খ'সে পড়ল গণি মিঞা, যেন ঝড়ের মুখে খড়।

আমি তখন বললুম, হুজুর, টাকা আমার কাছে নেই।

বললেন, নেই তো জানি, কিন্তু আছে কোথায় ?

হুজুরের কাছে।

চমকে বললেন, আমার কাছে ? নিজের পকেট দেখলেন, বুক পকেট, ভিতরকার পকেট, পাৎলুনের পকেট, ঘড়ির পকেট। বললেন, না তো।

বললুম, হুজুরের সামনেই আছে।

সামনে ? কোথায় ?

দোয়াতদান।

আচিনস সাহেব হাতের কলমটা নিয়ে দোয়াতের ভিতর ডুবিয়ে দিলেন, খানিকটা নাড়লেন, তারপর নিবের মুখে কালো টাকাটি টেনে বার ক'রে ঠক ক'রে ফেলে দিলেন। খানিকটা কালি প'ড়ে গেল টেবিলের সবুজ কাপড়ের উপর। তারপর ধীরে ধীরে দরখাস্তখানা তুলে নিয়ে কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, যেন ছিঁড়ে ফেললেন খুবলালের মন, বেঁচে রইল পেশকার। বললেন, খুবলাল, তুমি জিতলে, তোমার রিশওয়াতের টাকা আমি সুভ্‌নির করে নিলুম। এর পরে আমার এজলাসে তোমার সাত খুন মাপ।

রিশওয়াৎ যে নিতে হয়, সে কার জন্যে নেওয়া ? নিজের জন্যে

এত ছোট জিনিস নিয়ে আমাদের কি হবে, বাপু ? উপকারে লাগে না। যাঁদের জন্যে নিই, তাঁরাই জানেন, আবার তাঁরা জেনেও জানেন না। তাঁদের বিবিরা যে চার পয়সায় চব্বিশটা মুরগীর ডিম পান, সে কিসের খাতিরে ? শুনেছ কখনও ছ পয়সায় ছটা মুরগী, তিন পয়সা সেরে কাঁসার বাসন মেলে ? না বাপু, না, কিন্তু ক'র না, ওটা দিতে হয়।

খদ্দরের গান্ধী টোপি প'রে ঘুষ বন্ধ করবে তুমি ? যতদিন ঐ সবুজ কাপড়টার উপর কালির দাগ থাকবে, ততদিন আমাকে পূজো না দিয়ে চাতালে উঠতে পাবে না। দাও, ছাড়ো সিক্কা, পরে কাজের কথা ব'ল।

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

লিমারিক

(১)

অধিন মলয় বহে মধুর বসন্তে,
কোকিল, দোয়েল শ্যামা গাহে যে বনান্তে ;
কবি-মন পুলকিত,
মোর মন অতি ভীত,
মধুতু চাড়া দেয় "কড়া" পদপ্রান্তে।

(২)

নব-পরিণীত হাবু রাত দুই পহরে
প্রিয়ারে জড়াতে গিয়ে বাহু দিয়ে সজোরে
সহসা মারিয়া লাফ
ব'লে ওঠে—"বাপ, বাপ !"
বগলের ফোড়াটা সে ভুলেছিল কি ক'রে ?

(৩)

রেঁধে রেঁধে জ্বালাতন শ্যামলাল দে'র স্ত্রী,
স্বামীরে ছাড়িয়া হ'ল পর্দ্দাভিনেত্রী।
সেথানে ডিরেক্টার
পার্ট দেয় পাচিকার,
হায়, হায়, এর চেয়ে কে কুপার পাত্রী।

"একেরায়"

ভারত আমার

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মুদিল নেত্র—
গোঁড়ামির তুমি জন্মভূমি মা, গোলামির তুমি তীর্থক্ষেত্র!
দিয়েছ দানবে জড়ের জননী লুণ্ঠন-অপহরণে দীক্ষা,
দিয়েছ মানবে মৌন-ধৈর্য্যে সব নিপীড়ন সহনে শিক্ষা।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি জগদ্ধাত্রী!
নিঃস্বজনের তুমি মা জননী—বিশ্বজনের কৃপার পাত্রী!

যাহারা জগতে আত্মঘাতের তুলিল এদেশে ভেদের স্তোত্র
নহ কি মা তুমি, সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তোদের গোত্র!
তাদের ধর্ম্ম-বর্ম্ম আড়ালে লুটায়ে রহিব গুটায়ে পুচ্ছ,
দেশের দশের গরিমা যশের সব আহ্বান করি মা তুচ্ছ।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি জগদ্ধাত্রী!
নিঃস্বজনের তুমি মা জননী—বিশ্বজনের কৃপার পাত্রী!

অভিশাপ টীকা আঁকিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির ভাগ্যে,
মুনিবের পায়ে মুক্তি বিকায়ে যাত্রা তাহার মোক্ষ-মার্গে।
ভরেছে ভেদের কলুষ ক্লেদের গন্ধে সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম্ম।
পসার রাখিতে তাই প্রাণান্ত গলদ ঢাকিতে গলদঘর্ম্ম।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি জগদ্ধাত্রী!
নিঃস্বজনের তুমি মা জননী—বিশ্বজনের কৃপার পাত্রী!

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

বাঘ

যাহা শুনিতেছি, তাহার অর্ধেকও যদি সত্য হয় তো শুধু এখন কেন, আজ সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমি বাড়ির বাহির হইতে পারিব না; সেজন্য আপনারা আমায় কাপুরুষ, ভেতো বাঙালী—যা খুশি বলুন।

আমাদের বাড়িটা আপনারা দেখেন নাই। বাড়ির খিড়কির দিকটায় কাঠা পাঁচেক জমির উপর একটা মাঝারি গোছের বাগান আছে। তাহার শেষ দিকটা, জাম আর জামরুল গাছের ডালপালায় বেশ একটু অন্ধকার। একটু যা খালি জায়গা ছিল, সেখানটায় আজকাল একটা বিচালির গাদা তৈয়ার করা হইয়াছে। মোটের উপর সব মিলিয়া জায়গাটা বেশ একটু ঘুপটি গোছের হইয়া গিয়াছে, রাত্রিবেলায় গাঢ় অন্ধকারের আড্ডা। অবশ্য তার পরেই গয়লা-পাড়ার ঘন বস্তি, তবু ছেলেবেলায় ঐ কোণটুকুর কথা রাত্রে ভাবিতে গেলে বরাবরই গা ছম-ছম করিত। আর, সত্য কথা বলিতে কি, এখনও না ভাবিলেই ভাল থাকি। সেইখানে খড়ের গাদার পাশে সন্ধ্যার পর হইতে একটা বাঘ আসিয়া বসিয়া আছে। গোবাঘা না, চিতাও নয়, একটা জাত বাঘ; কিছু নয় তো হাত ছয়েক লম্বা, কাঁচা সোনার মত হলদে রঙের ওপর হাত খানেক করিয়া লম্বা এক একটা কালো ডোরা, ইয়া ঘোরাল মুখ, এক একটা গোঁফ যেন এক একটা সজারুর কাঁটা। সামনের দুইটা থাবা ছড়াইয়া ঘাড় উঁচাইয়া বসিয়া আছে, পেটের ঢিলাঢালা মাংসটা হাত পাঁচ ছয়ের একটা গোল জায়গার উপর ছড়াইয়া আছে। বেশ বোঝা যায়, আস্ত একটা মহিষ হইলে ওই পেটের কতকটা ভরিতে পারে।

তবে বাঘ যে নিতান্ত উপোস করিয়া আছে এমন নয়, একটু জল-খাবার সারিয়া লইয়াছে। জেওলগাছের বেড়া ডিঙাইয়া আমাদের

বাগানে পড়িবার আগে, বুধনী গয়লানীর যে কচি মেয়েটা অষ্টপ্রহর ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া পাড়া মাথায় করিত, সেটাকে জিবে করিয়া তুলিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছে, বুধনী মেয়েটাকে বাইরের দাওয়ায় শোয়াইয়া রাখিয়া ঘরের পাট সারিতেছিল। মেয়েটার গায়ে দাঁত বসে নাই, সেই জন্য বোধ হয় পেটে গিয়াও ট্যাঁ ট্যাঁ করিতেছিল, বাঘটা জ্বালাতন হইয়া সেইখান হইতে একটা লাফ দিয়া হরুনী মাহতোর বাড়িতে পড়ে। হরুনীর বুড়া বাপ বাহিরে বসিয়া ভজন করিতেছিল। শুধু মাংস খাইয়া বাঘের একটু হাড় চিবাইবার ইচ্ছা হয়। হরুনীর বাপের ঘাড়টা ধরিয়া দুটো ঝাঁকানি দিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া এক লাফে আমাদের বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

টের পাওয়া যাইত না; ওদিকে গয়লা-পাড়া ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর সন্ধ্যার পর আমাদের বাগানের দিকেও বড় একটা যায় না কেহ। ঝপাং করিয়া একটা শব্দ হয় বটে, কিন্তু সেটা যে বাঘ পড়ারই শব্দ লোকে কি করিয়া জানিবে? বাঘ তো আর রোজই দুইদশটা করিয়া লাফ দিয়া পড়িতেছে না। একটা কলাগাছ নুইয়া গিয়াছিল, সবাই ভাবিল, বোধ হয় সেইটিই ভূমিসাৎ হইয়াছে। নিশ্চিন্ত আছে, এমন সময় কড়-কড়-কড়-কড়-কড়াৎ! সে এক বিকট আওয়াজ—যেমন বিনা ঝড়ে গাছ পড়া, তেমনই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

পরে টের পাওয়া গেল, বাজ পড়া নয়—বাঘটা হরুনীর বুড়া বাপের দুই থাবা দিয়া মুড়িয়া-সুড়িয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দাঁতের একটা চাপ দিয়াছিল, সমস্ত হাড়গুলা একসঙ্গে চুর হইয়া যাওয়ায় ঐ রকম বিকট আওয়াজ হইয়াছে। আশি বছরের বুড়া হরুনীর বাপ, সোজা কথা নয় তো? হাড়ের পরিপক্কতা দেখিতে গেলে একেবারে দধীচি হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু শব্দের রহস্য ভেদ করিতে যাইয়াই কাল হইল। বাগানের এদিকটায় আমাদের মালী মহিষটাকে জাবনা দিতেছিল, খড়ের গাদার কাছে হঠাৎ একি বিপরীত শব্দ! হাতের জাবনা মুছিতে মুছিতে দেখিতে যাইবে—দেখে, অন্ধকারের মধ্যে ঠিক খড়ের পাছটিতে দাউদাউ করিয়া দুইটা আগুনের ভাঁটা জলিতেছে। বেচারা আর ভাবিতেও সময় পায় নাই, ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া মহিষের জন্য তোলা বালতিসুদ্ধ সমস্ত জল লইয়া গিয়া একেবারে বাঘের মাথায়। যখন হুঁস হইল, আগুন নয়, বাঘের চোখ, তখন মালীর নিজের চোখ ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে—ব্যাঘ্ররাজের একটি থাবায়। বাঘের গলায় তখন হরুনীর বাপের উরুর হাড়টা ফুটিয়া গিয়াছে। যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে সে বেচারী বোধ হয় সারসের সন্ধানে জলার দিকে পা বাড়াইয়াছিল,—চুকিয়া যাইত সব ল্যাঠা—এমন সময় ঐ নূতন উপদ্রব! সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের উপর থাবাটি বসাইয়া একটি চাপ।

ব্যাপারটা আপাতত এইখানেই শেষ হইত। বাগানের একপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে যে এতবড় একটা কাণ্ড হইতেছে, কে কি করিয়া জানিবে? বড়রা নিজেদের গল্পগুজব লইয়া আছে, ছেলেমেয়েরা নিজেদের পড়াশুনা লইয়া আছে, কুঁচোরা নিজেদের হুল্লোড় লইয়া আছে। হয় সকালবেলায় ব্যাপারটা সবার জ্ঞানগম্য হইত, কিংবা বাঘ যদি সব নিশ্চিহ্ন করিয়া রাতারাতি সরিয়া পড়িত তো তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। জানাজানি করিয়া দিল মহিষটা। মালীর নিয়ম ছিল জাবনাটি ঠিক তৈয়ার করিয়া মহিষটাকে এই খোঁটায় আনিয়া বাঁধিয়া দিত, সঙ্গে সঙ্গে বাছুরটাকে খুলিয়া দিত। বাছুরটাকে একটু পিয়াইয়া মালী দুধ দুহিতে আরম্ভ করিত। এদিকে মহিষ জাবনা খাইয়া যাইত।

তৈয়ারি জাবনার সোঁদা সোঁদা গন্ধ বাহির হইয়াছে, অথচ খাইতে পাইতেছে না। মহিষটা ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু গুজরাটী মহিষ; এদেশের দড়িকে মনে করে সুতা, খোঁটাকে মনে করে একটা কুটা; নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে চুপচাপ করিয়া বাঁধা থাকে। যখন নিতান্ত আর সহ্য করিতে পারিল না, দিল মাথার একটা ঝাঁকানি। একটা ঘাসের শিকড় টানিলে যেমন নিরুপদ্রবে উঠিয়া আসে, খুঁটিটা সেই রকম ভাবে উঠিয়া আসিল। মহিষ হাঁস-হাঁস করিয়া সমস্ত জাবনাটা সাবাড় করিল, তারপর বাছুরটার কাছে গিয়া তাহাকে সমস্ত দুধটা খাওয়াইয়া দিল; এখানকার মহিষ তো নয়,—এক দোহনে পাকা সাত সের দুধ দেয়।

বাছাকে খাওয়াইয়া তখন তাহার মালীকে মনে পড়িল। মালীকেও মনে পড়িতে পারে, কিংবা জলতৃষ্ণাও পাইতে পারে, মহিষের মনের কথা কে বলিবে? মালীটা জলের বালতি লইয়া যেদিকে গিয়াছিল, জাবনা-ভরা পেটটা দুলাইতে দুলাইতে, জাবর কাটিতে কাটিতে মন্থর গতিতে সেই দিকে অগ্রসর হইল। যেন ওপাড়ার কালোপিসী নেমন্তন্ন খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে টহল দিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর দুই পা গিয়াই ঐ দৃশ্য!

গুজরাটী মহিষ, তায় নূতন বাচ্চা হইয়াছে, বাঘ দেখিয়া রাগে একেবারে কয়লার আগুনের মত গনগন করিয়া উঠিল। বাঘের চোখের আর কি জলন?—মহিষের চোখ জ্বলিতে লাগিল যেন মোটর গাড়ির দুটো হেডলাইট; তিনটা করিয়া পাক দেওয়া শিং একেবারে সোজা হইয়া উঠিল, যেন দুইটি বর্শা—লক্ষ্য বাঘের জলন্ত চোখ দুইটি। মাথা গুঁজিয়া, ক্ষুর দিয়া এক আঁচড়ে এক এক কোদাল মাটি চাঁছিয়া পিছনে

ফেলে আর গোঁ—গোঁ শব্দ! যেন সেদিনকার মত ঈষাণ কোণে কালবৈশাখী ঝড় উঠিয়াছে।

বাঘের চোখের পলক পড়ে না, ভয়ে যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, পেটের মধ্যে বুধনীর মেয়ের চিঁ চিঁ শব্দটুকু পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, হরুনীর বাপকে চিবাইতেছিল;—একে এমনই শুকনো হাড়ের গাদা, তায় যা একটু আধটু রস ছিল, ভয়ে গলা শুকাইয়া সব একেবারে ছাতু হইয়া গিয়াছে। গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হয় না, তবুও মহিষের পানে চাহিয়া কোন রকমে ভয়ে কাঁপা গলায় বলিল, লম্বা লম্বা শিং তোমার—

* * *

বড় বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে।

শুইয়া শুইয়াই পাশের ঘরের পানে চাহিয়া বলিলাম,—রাণু বড্ড ভুল করছ মা, কচি ছেলে, ওকে এখন অত উৎকট ভয়ের গল্প শুনিও না। তোমাকে আমি দেখিয়ে দোব বইয়ে যে, ওতে ওদের মনে কি ভীষণ চাপ পড়ে। বাঘটাকেই যথেষ্ট উগ্র করেছিলে, তার ওপর তুমি আবার মহিষটাকে যেমন দাঁড় করাতে চাইছ, তাতে—

রাণু ক্লান্তি ও বিরক্তিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল; আমার দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল, ভয় দেখে যাও মেজকাকা, এততেও ও দজ্জালের চোখে একটু ভয় আছে কিনা! আর এর বেশি আমার মাথায় আসেও না বাপু। তুমি বইয়ের কথা বলছ! ঐ শোন আবদার উঠেছে, বাঘ আর মোষের লড়াই দেখতে নিয়ে যেতে হবে। আমি পেরে উঠব না ও ছেলেকে মেজকাকা, সামলাও তোমার নাতি, আমার রাজ্যির পাট প'ড়ে আছে—

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

চণ্ডীদাসের ভাষা

আজ যেমন সাহিত্য-সৃষ্টির কেন্দ্র কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমগ্র বাংলা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, একদিন সেইরূপ বীরভূম অঞ্চলের ভাষা পদাবলী-সাহিত্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল,—ইহা অনুমান করা অসঙ্গত বা অসমীচীন হইবে না। অবশ্য, বৈবাহিক সম্বন্ধ, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি কারণান্তরেও এক স্থানের ভাষা স্থানান্তরে গতিবিধি করিয়া থাকে। যাহা হউক, বাংলার অধিকাংশ উচ্চাঙ্গের পদাবলী-সাহিত্যই এই অঞ্চলে সৃষ্টি ও পুষ্টি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে শাসনসংক্রান্ত সুবিধার জন্য বৃহত্তর বীরভূমের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়া সীমানার একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডি টানিয়া দেওয়া হইয়াছে; পূর্ব্বে কিন্তু, বীরভূম ছিল বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বাংলার গোবিন্দদাস, লোচনদাস, নরহরি সরকার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর, রায়শেখর, শশিশেখর, কবিশেখর, যাদবেন্দ্র প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্ত্তাগণ এই অঞ্চলেই জন্মলাভ করিয়া এইখানকার ভাষাতেই পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। অপরাপর অঞ্চলের পদাবলী-রচয়িতাগণের সম্বন্ধে বলা যায়, তাঁহারাও এই অঞ্চলের ভাষার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই,—পারা সম্ভবও ছিল না,—যেমন আজ বঙ্গদেশের তথা বৃহত্তর বঙ্গের সমস্ত সাহিত্যিকই মূলতঃ কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাকে আদর্শ করিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিতেছেন।

কিন্তু দেশান্তরের ভাষার প্রভাব কোন অঞ্চলের ভাষাগত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে না; জনসাধারণ—বিশেষতঃ

অশিক্ষিত পল্লীনারীসম্প্রদায় স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষাকেই যথাসম্ভব ভাবাভিব্যক্তির বাহন করিয়া রাখে। তবে স্থানান্তরের ভাষা তাহাতে কিছু কিছু মিশিয়া যায় বটে। আর বিভিন্ন স্থানের ভাষার অনুকৃতির চাপে কালক্রমে স্থানীয় ভাষার আংশিক লুপ্তিও ঘটে; কিন্তু বাগ্বিধি বা উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য সহজে লুপ্ত হয় না। বর্ত্তমানে তাই দেখি,—পদাবলীর ভাষার প্রভাব খর্ব্বের পর এক দিকে বীরভূম অঞ্চলের বাহিরের লোক যেমন আজ আর বীরভূমের ভাষা ব্যবহার করে না, স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে, অন্য দিকে সেইরূপ বীরভূমবাসীরা কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার এই বিপুল প্রভাবের যুগেও, স্বভাষার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে বর্জ্জন করে নাই। চণ্ডীদাসের ভাষার আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখিব, বীরভূম অঞ্চলের যেসব বিশিষ্ট প্রাদেশিক শব্দ, বাগ্বিধি এবং উচ্চারণ-ভঙ্গি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত, বীরভূমের খাঁটি বাসিন্দারা আজও তাহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তবুও, ভাষার এই আন্তঃপ্রাদেশিক সংমিশ্রণের যুগে এখানকার স্থানীয় ভাষা অনেকখানি বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহা অস্বীকার করা যায় না। ঠিক একই কারণে, পূর্ব্বে বীরভূমেতর অঞ্চলে বীরভূমের প্রাদেশিক ভাষা কিছু বিকৃতি আনিয়াছিল এবং এইজন্যই হয়তো বর্ত্তমানেও কোন কোন জেলার স্থানে স্থানে প্রাচীন বীরভূম অঞ্চলের ভাষার ছিটে-ফোঁটা এক-আধটা শব্দ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী উভয়ত্রই এই খাঁটি বীরভূমের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং সে ভাষার অধিকাংশ আজও বীরভূমে চলিতেছে। বর্ত্তমানে বাঁকুড়ার ছাতনা চণ্ডীদাসের দেশের দাবি করে। কিন্তু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে প্রবাদগুলি প্রচলিত আছে, একমাত্র বীরভূম-

নান্নুরেই সেগুলির সহজ সমর্থন পাওয়া যায়, বহুবার তাহা দেখানো হইয়াছে। নান্নুর, বাশুলী, চণ্ডীদাস ও রামীকে এক বীরভূম ছাড়া একসঙ্গে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, ইহাও সিদ্ধান্তিত তথ্য। চণ্ডীদাসের সহিত মিথিলেশ শিবসিংহ ও বিদ্যাপতির গঙ্গাতীরে মিলন এক বীরভূম নান্নুর হইতেই সম্ভব। নরহরি হইতে তরুণী-রমণ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচীনেরা চণ্ডীদাসকে নান্নুরেই দেখিয়াছেন। বাংলার জন-সাধারণও জনপরম্পরাক্রমে বীরভূম নান্নুরকেই চণ্ডীদাসের দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে। চণ্ডীদাসকে বীরভূম হইতে স্থানান্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার অপপ্রচেষ্টায় 'চণ্ডীদাস চরিত' নামক যে পুঁথি সমুদ্ভব হইয়াছিল,—ভট্টশালী মহাশয়ের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহা নিঃসংশয়ে জাল বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন; এবং বিদ্বদ্বন্ধু মহাশয়, অধ্যাপক সুনীতিকুমার, পরলোকগত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ তাঁহার পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। ছাতনার 'নুনুর মাঠ'কে 'নান্নুর গ্রামে' রূপান্তরিত করিবার যে চেষ্টা চলিতেছিল তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। 'বড়ু' শব্দটিকে লইয়া এখনও যে ভাষাতত্ত্বে প্যাঁচ কষা চলিতেছে, সে সম্বন্ধে বলা যায়, স্বমতের পোষকতার অনুরোধে 'বড়ু' শব্দের যে অর্থ-ই যিনি করুন না, প্রাচীনেরা কিন্তু 'বড়ু'কে 'বটু'—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা পূজারী ব্রাহ্মণরূপেই চিনিতেন। পদকর্ত্তা 'শেখর' তাঁহার এক পদে 'বটু' ও 'বড়ু' উভয় শব্দই ব্রাহ্মণ বা পূজারী ব্রাহ্মণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন—

তারে দেখি মনে সুখী এলায় মাথার কেশ।
রসিক নাগর রসের সাগর ব্রাহ্মণের বেশ॥
গলে পাটা ভালে ফোঁটা কোশাকুশি করে।
ছোট কাছা মোটা কোঁচা কটি আঁটি পরে॥

লৈয়া পুঁথি হৈয়া যতি আইলা দেবের ঘরে।
পূজার সজ্জ দেখি দ্বিজ মন শন শন করে॥
ক্ষীরের লাড়ু দেখি 'বড়ু' কহে বারে বার।
আইস সবে পূজহ দেবে রৈতে নারি আর॥
হেরি 'বটু' করি চাটু কহে সুধামুখী।
নাগর পানে চায় সঘনে 'বটু' কটু দেখি॥

* * *

সবে মেলি করে কেলি বসি পূজার ঘরে।
দেখি বুড়ী শেখর সাড়ি সবায় সত্বর করে॥

বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখিব,—বড়ুর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাষাও বীরভূমের।

প্রথমে পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাষা আলোচনা করিব।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'র প্রথম সংস্করণ বাহির হয় ১৩০১ সালে, এবং ১৩০৫ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। সেই সময়ে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি নব্যভারতে (দ্বাদশ খণ্ড, চৈত্র সংখ্যা) কাব্যবিশারদ মহাশয়ের 'বিদ্যাপতি'র সমালোচনা করেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে ক্ষীরোদবাবু বলিয়াছেন,—'চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দুই প্রকার ভাষা দেখা যায়,—এক বীরভূমের বাংলা, আর এক ব্রজ বোলী।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,—আজ হইতে ৪৫।৪৬ বৎসর পূর্ব্বেও সাধারণে জানিত, চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা বীরভূমের। বাঁকুড়ার দাবি তখনও উত্থাপিত হয় নাই।

পক্ষান্তরে বাঁকুড়ার বিদ্যানিধি মহাশয়ও দেখিয়াছেন, দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভাষা বাঁকুড়ার নহে। (বাঁকুড়ার সারস্বত সমাজের উদ্বোধন পত্র, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০; ২৪১ পৃষ্ঠা)

সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসে'র 'একদিন গোচারণে সকল সখাসনে' পদে (চণ্ডীদাস, ১ সংখ্যক পদ) আছে,—

দেখিল ধবলী নাই খুঁজিল অনেক ঠাঁই
অনুসারে চলিল 'পাজিয়া'।

এখানে 'পাজিয়া'র অর্থ 'পাঁজ' অনুসরণ করিয়া, বীরভূমে পদচিহ্নকে 'পাঁজ' বলে।

ঐ পদেই আছে,—বৃকভানু মহলেতে 'উগি' ; 'উগি' মানে খুঁজিয়া বীরভূমের লোকে বলে, সারা গাঁ-খানা 'উগুটে' এল ; কোন জিনিসের খোঁজ না পাওয়া গেলে বলে, 'উগল' নাই।

'রমণীর মণি দেখিনু আপনি' পদে (চণ্ডীদাস, ৬ সংখ্যক পদ) পাই —জলের 'কান্ধারে' কেশের আঁধারে ; বীরভূম অঞ্চলের নদীর ধারে সরস নিম্নভূমি বা জলাভূমিকে 'কাঁধা' বলে ; বীরভূমের সতীশের পদে আছে ;—

মরুভূমি মাঠান জমি চোখের জলে হবে 'কাঁধা' ;
ও তুই, বইতে কামাই দিসনা হুনী, আগুলে রাখিসনা মাদা।

'বেলি অসকালে দেখিনু ভালে' পদে (চণ্ডীদাস, ৭ সংখ্যক পদ আছে,—

অমিয়া 'ছানিয়া' যতন করিয়া ;

'ছানিয়া' বীরভূমে 'সানিয়া' উচ্চারণে প্রচলিত ; এখানকার লো ভাত 'সানিয়া' খায় ;—আটা বা ময়দা মাখে না,—'সানে'।

রূপ দেখি মোহিত হইল কতজনা।
নগরে 'চাতরে' সব পড়িল ঘোষণা। (চণ্ডীদাস, ৩১ সংখ্যক প

কাহারও গোপন কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করা বুঝাইবার সময় বীরভূমের লোক 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গে' না,—'চাতরে' হাঁড়ি ভাঙ্গে।

বাজিকর-বেশে মিলন সম্বন্ধে বলা যায়,—নানুরের ছয় সাত মাইল দক্ষিণে 'শিমুলগাঁ'য়ে অনেক বাজিকর জাতির বাস ; বীরভূমের অন্যত্রও এই বাজিকর জাতি অনেক বাস করে।

'সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো' পদে (চণ্ডীদাস, ৬২ সংখ্যক পদ) আছে,—'চাঁদ নিঙ্গারি কৈল থেহা' ; 'থেহা' বীরভূমে 'থ্যা' উচ্চারণে ব্যবহৃত হইতেছে ; ছেলেপিলেরা কাপড়-জামা ময়লা করিলে ও ছুটিপুঁটি করিয়া ভাঁজ ধরাইলে বাপ-মায়েরা বলেন,—এরি মধ্যে কাপড়টা 'থ্যা' ক'রে আনলি!

'নিতি নিতি আসি যাও রাধা সনে কথা কও' পদে (চণ্ডীদাস, ৬৫ সংখ্যক পদ) আছে,—

চেটোনেটো যায় জলে ;

বীরভূম অঞ্চলে চঞ্চলা কিশোরী বা যুবতীকে 'চেটোনেটো মেয়ে' বলে। 'কানুর পীরিতি কুহকের রীতি' পদে (চণ্ডীদাস, ৭২ সংখ্যক পদ) আছে,—

'কতক্ষণ বই' হাতে বাঁশ লই
যুবতী হিয়ায় গাড়ে।
'জাঙ্গে-জাঙ্গে' দিয়া পায়েতে ছাঁদিয়া
রাইএর আঙ্গিনায় পড়ে।

'খানিক পরে' বুঝাইতে বীরভূমের লোক বলে,—'খানিক বই' বা 'কতক্ষণ বই' ; 'জাঙ্গে জাঙ্গে' বীরভূমের নিত্যব্যবহারের ভাষা ; বলে, —জাঙ্গে জাঙ্গে ছাঁদ লাগিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলে ; জঙ্ঘা-প্রমাণ জল বুঝাইতে বলে,—'এক জাঙ্গ জল'।

'সই 'হের' না দেখহ 'সিয়া'' পদের (চণ্ডীদাস, ৯৭ সংখ্যক পদ) 'হের' শব্দ 'এখানে' অর্থে বীরভূমের সর্ব্বত্র প্রচলিত ; 'এখানে এস দেখ' বুঝাইতে এ অঞ্চলের লোকে বলে,—'হেঁর দেখ সিক্কে' ; পদাবলীর চণ্ডীদাস একাধিক পদে 'হের' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'ও এই 'হের' শব্দ বহু পদে ব্যবহৃত হইয়াছে—

মারা হের রাধার বিরহে ('আজি রজনীতে বড়ায়ি দেখিলোঁ স্বপনে' পদ, জন্মখণ্ড)।

'হের' ভাল ফুল হোর ভাল ফল ('সুন গোপী আহ্মার বচন' পদ, বৃন্দাবন খণ্ড) ইত্যাদি।

এই পদের 'সিয়া' বীরভূমের ক্রিয়াপদ প্রয়োগের এক বিশিষ্ট ভঙ্গি; বীরভূমের লোকে বলে,—'করসিক্কে', 'খাওসিক্কে', 'দেখসিক্কে' ইত্যাদি। চণ্ডীদাস পদাবলীতে বহুস্থানে এই 'সিয়া' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে—

সই হের আসি দেখ 'সিয়া' (চণ্ডীদাস, ৪৭১ সংখ্যক পদ)

দেখ অপরূপ 'সিয়া' (ঐ ৫০০ সংখ্যক পদ)

দেখ দেখ রূপ 'সিয়া' (ঐ ৫০২ সংখ্যক পদ)

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'ও 'সিআঁ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে—

আজি রজনীতে বড়ায়ি দেখিল স্বপনে।
রাধা 'সিআঁ' বসিলীশয়নে॥ ('শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', তাম্বূল খণ্ড)

'কোন সখী বলে শুন রসময়ী' পদে (চণ্ডীদাস, ১১০ সংখ্যক পদ) আছে—

যার ঘরে আছে দুধের 'বাথার' ;

বীরভূম অঞ্চলে ধানের মরাইকে 'বাথার' বলে ; এই পদে 'বাথার' ভাণ্ডার বা জালা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ; 'দুধের বাথার', 'টাকার বাথার' 'বাথারের কাছে ঢেঁকি' বীরভূমের নিত্য-ব্যবহৃত বাগ্বিধি।

'কহিছে বড়াই শুন ধনী রাই বেলা সে 'উচর' হ'ল' পদের (চণ্ডীদাস, ১৪১ সংখ্যক পদ) 'উচর' শব্দ বীরভূমে সকলের নিকটেই সুপরিচিত ; জলখাবার বেলা অতিক্রান্ত হইয়া গেলে এখানকার লোকে বলে, 'জলখাবার বেলা 'উচর' হক্কে গেল'।

বীরভূমে 'দিচ্ছেন' বা 'দিচ্ছে' উচ্চারণ কেহই করে না, বলে 'দিছেন' বা 'দিছে' ; চণ্ডীদাস পদাবলীতেও এই 'দিছেন, ও 'দিছে' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে—

সবে অন্ন খায় মাঝে যদুরায় 'দিছেন' সবার মুখে
(চণ্ডীদাস, ১৫৩ সংখ্যক পদ)

ধরিয়া চরণ জাতিয়া 'দিছেন' শীতল পাথার বা
(চণ্ডীদাস, ১৭৮ সংখ্যক পদ)

তাহে শ্যাম 'দিছে' দেখাইয়া (ঐ, ৪৭৯ সংখ্যক পদ)

হচ্ছে, যাচ্ছে, খাচ্ছে, দিচ্ছে প্রভৃতির বীরভূম-মার্কা উচ্চারণ, হোছে যেছে, খেছে, দিছে ইত্যাদি।

'রাধিকা আদেশে মনের হরষে কুসুম রচনা করে' পদে (চণ্ডীদাস, ২০৭ সংখ্যক পদ) আছে,—ফুলের 'আচির' ফুলের প্রাচীর ফুলের হইল ঘর।

এই 'আচির' শব্দ প্রাচীর শব্দের পূর্ব্বে সংযুক্ত হইয়া বীরভূম অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় ; কেহ কেহ মনে করেন,—'আচির' ও প্রাচীর একার্থবাচক ; কিন্তু মনে হয়, ইহার উৎপত্তি সংস্কৃত 'অজির' (প্রাঙ্গণ) শব্দ হইতে। বীরভূমে 'আঁচিরে-পাঁচীরে ঘুরে বেড়ানো' কথাটার খুব চলতি আছে। একটি সর্ব্বজনপরিচিত ছড়ার বীরভূম-প্রচলিত পাঠ নিম্নরূপ—

আঁচিরে-পাঁচীরে বেড়ায় তার নামটি কি ?
ভাগের বেলায় দুনো দুনি,—আমি জানি কি ?

আজ হ'তে হলো রে ভাই সমান-সমান।
তবে, আঁচিরে পাঁচীরে বেড়ায় বীর হনুমান।

বীরভূমের লোকের পায়েই কাঁটা 'ভুঁকে' ('যদি শুই তাই কাঁটা ভুঁকে গায়'—চণ্ডীদাস, ২১০ সংখ্যক পদ),—অন্য অঞ্চলের লোকের পায়ে কাঁটা 'ফুটে'।

বউদের মুখের 'তোড়া' ('কুটিল নয়নে কহিছে সুন্দরী অধিক করিয়া 'তোড়া''—চণ্ডীদাস, ২২২ সংখ্যক পদ) এ অঞ্চলে শাশুড়ীদের মনে সন্ত্রাস জাগায়। 'তোড়া' মানে 'চোপা'।

ক্রমশ

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

সোনার বাংলা

দু টাকা ভরির সোনার দোকানে গিয়েছে শহর ভরি
সোনার বাংলা দেশে।
সে সোনা কিনিয়ে দলে দলে লোকে
পুরুষ এবং নারী
মেকি সোনা দিয়ে মেটায় মনের সাধ।
সস্তা চটকে ভুলাতে লোকের মন
পশরা সাজায়ে রয়েছে ধূর্ত্ত লোকে,
তাই দেখিবারে হাজারো লোকের ভিড়।
সোনার বাংলা—সোনার বাংলা, হায়!

"সু"

মহামারী

কাঞ্চন নদী মরিতে মরিতে একেবারে মরিয়াই গেল। অন্যান্য বৎসর আধ হাত পরিমাণ জায়গা জুড়িয়া যে ক্ষীণ জলস্রোত বহিয়া যাইত, দুই দিকের প্রশস্ত তৃষ্ণার্ত্ত বালুচর সেটুকুকেও নিঃশেষে শুষিয়া লইল। শ্মশান-ঘাটটা একেবারে হলদি বিলের কাছে সরিয়া আসিল এবং ন্যাড়া শিমূলগাছটার ডালে বসিয়া চৈত্রের প্রখর দ্বিপ্রহরে জলের পরিবর্ত্তে জ্বলন্ত বালির দিকে তাকাইয়া একটা পিপাসাতুর শঙ্খচিল অশ্রান্তভাবে কাঁদিতে লাগিল। শ্মশানকালীর শিকড়-নামা ভাঙা মন্দিরটাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া চিতার ছাই মিশানো বালি দমকা বাতাসের তালে তালে ঘূর্ণি নাচিয়া চলিল।

মধ্যরাত্রিতে রাইচরণ গোপের স্ত্রী নয়নতারার আচমকা ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে শুনিল, খুব স্পষ্ট করিয়াই শুনিল, যেন একটা অদ্ভুত অমানুষিক কান্নার শব্দ শ্মশানকালীর মন্দিরের দিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। সে শব্দটা শ্মশান পার হইল, জেলেপাড়া ডিঙাইল, তারপর গ্রামের চারিদিকের অন্ধকার বন-জঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করিয়া, রাত্রির বুকে ভয়ের স্পন্দন জাগাইয়া—কাঞ্চনের পরপারে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া আসিল।

নয়নতারার বুক থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে এবং চৈত্রের গুমট গরমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিতে লাগিল। স্বামীকে একটা ঠেলা দিয়া সে বলিল, শুনছ?

রাইচরণ পাশ ফিরিয়া বলিল, অ্যাঁ, হয়েছে কি?

অমন ক'রে কে কাঁদছে বল দেখি?

রাইচরণ জাগিয়া, কান পাতিয়া কহিল, কোথায় কে কাঁদছে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলে বোধ হয়।

হয়তো তাই। হয়তো ঘুমের ঘোরেই সে শব্দটা শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু নয়নতারার ভয় কাটিল না। তাহার কানের কাছে সেই অদ্ভুত অস্বাভাবিক কান্নার শব্দটা থাকিয়া থাকিয়া বাজিতেই লাগিল।

কিন্তু শেষরাত্রে রাইচরণ একবার বাহিরে গেল।

ফিরিল অসহ্য পেটব্যথা লইয়া এবং পাঁচ মিনিট পরে তাহাকে আবার বাহিরে যাইতে হইল। দুইবার, তিনবার, চারবার, তারপরেই বমি সুরু হইল। কলেরা।

ভোরের আলো যখন চৈত্রবিবর্ণ আমবাগানের ফাঁক দিয়া গোয়ালা-পাড়ায় আসিয়া পড়িল, তখন রাইচরণের বুক পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বৈধব্যযন্ত্রণা নয়নতারাকেও বহিতে হইল না। হলদি বিলের কলমী-দামের মধ্যে রাইচরণের দেহের অঙ্গারগুলি ধুইয়া দিয়া শ্মশানবন্ধুরা যখন ঘরে ফিরিল, ততক্ষণে নয়নতারার জন্যও বাঁশের মাচা বাঁধা হইয়া গিয়াছে।

এক বাড়ি হইতে দুই বাড়ি, দুই বাড়ি হইতে তিন বাড়ি। সন্ধ্যার মধ্যে গোয়ালাপাড়ার একটি ঘরও আর বাকি রহিল না। আর মৃত্যুও আশ্চর্য্য রকমেরই বলিতে হইবে। পড়িল, কি মরিল। তিন চার ঘণ্টার বেশি রোগযন্ত্রণা অনেককেই বহিতে হইল না, এবং সুযোগ ও সময়ের অভাবে ডাক্তারের খরচটা একেবারে বাঁচিয়া গেল। হলদি বিলের ধারে চিতা জ্বলিয়া চলিল অনির্ব্বাণভাবে, এবং সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘন হইয়া আসিল, তখন পাঁচ-সাতটি চিতার রক্তশিখা যেন কতকগুলি লোলুপ জিহ্বার মত কলমীদাম-ঘেরা জলে অশুভ দীপ্তি বিস্তার করিয়া নাচিতে লাগিল। মড়া-পোড়ানো ধোঁয়ার বিষাক্ত গন্ধে

আকাশ আবিল হইয়া গেল। বিলের ধারে ধারে সারি-বাঁধা তালগাছ-গুলির পত্রপল্লব ধোঁয়ার রঙে বিবর্ণ হইয়া আসিল।

সকাল না হইতেই সে মৃত্যুতরঙ্গ জেলেপাড়ায় আসিয়া পৌঁছিল, তারপর অরও একটু বেলা বাড়িতে ভদ্র অঞ্চলে আসিয়া দেখা দিল। বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত মহামারী বহিয়া আসিল, শ্রেণী সমাজ ছোট বড় কাহারও কোন সীমারেখা মানিয়া গেল না।

মহামারী আসিল।

দেবতা মারিতে সুরু করিলেন। যাহারা পড়িল, তাহাদের উঠিবার আশা রহিল না, এবং যাহারা পড়িল না, তাহারা পড়িবার ক্ষণ গণিতে লাগিল। গ্রামটি ছোট হইয়াও ছোট নয়—সামান্যতম যেটুকুবা জীবন-চাঞ্চল্য ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল নিঃশেষেই। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঘরে ঘরে কবাট পড়িতে লাগিল, বাবলা এবং ফণি-মনসায় ঘেরা হলদি বিলে যাইবার পথটি হরিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা। সন্ধ্যা তো নয়, মৃত্যু যেন তার ধূসর ছায়াটা গ্রামের উপর দিয়া বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। মাসটা চৈত্র, তবু কেমন যেন অস্পষ্ট একটা কুয়াশা কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে মিশিয়া রাত্রিটাকে আরও বীভৎস করিয়া তোলে। পথ দিয়া তখন একটি মানুষও চলাচল করে না, আড়ষ্ট বিভীষিকায় চারিদিক যেন থমথম করিতে থাকে এবং মনে হয় যেন গ্রামের উপর দিয়া শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া কি একটা জিনিস উড়িয়া চলিয়াছে। হয়তো বাতাস, হয়তো বা কিছুই নয়।

সন্ধ্যা হয়—রুদ্ধ-কবাট ঘরের মধ্যে জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব চলে। পারিবারিকতার এক একটা ইতিহাস বদলাইয়া যায়, পোড়া অঙ্গারে বিলের সবুজ কলমী-দাম কালো হইয়া উঠে।

অথচ, তখনও গ্রামের মধ্যে একটি ঘরের জানালায় নিতান্ত অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে কালি-পড়া ময়লা লণ্ঠনের আলো টিমটিম করিয়া জ্বলে। সেটা জগৎ চক্রবর্ত্তীর লাইসেন্স-প্রাপ্ত দেশী মদের দোকান।

জগৎ চক্রবর্ত্তীর বাড়ি পূর্ব্ববঙ্গে। দরিদ্র যজমানী ব্রাহ্মণের সন্তান—প্রায় ত্রিশ বছর আগে যাত্রার দলে ভিড়িয়া দেশ ছাড়িয়াছিল। উত্তর বাংলার এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসিয়া অধিকারী তাহাকে ছাড়িলেন। জগতের সমস্ত গা ভরিয়া মায়ের অনুগ্রহ ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। অতএব, গ্রামের চণ্ডীতলায় মায়ের উপরেই তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া অধিকারী রাতারাতি সরিয়া পড়িলেন। বাঁ চোখটা পচিয়া খসিয়া গেল, চেহারা হইল বীভৎস কদাকার, কিন্তু জগৎ মরিল না। মদের দোকানের মাতাল ভেণ্ডার রঘুবীর কালোয়ার নেশার ঝোঁকে তাহাকে কুড়াইয়া আনিল। রঘুবীরের মৃত্যুর পরে আজ প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া জগৎ চক্রবর্ত্তী এই মদের দোকান চালাইয়া আসিতেছে। নিঃসন্তান মানুষ, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, দেশ-গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার ভাবে দোকানটার স্বল্প আয়ের উপর দিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিতেছে মাত্র।

একটা পাঁইট দিও হে চক্রবর্ত্তী।

চমকিয়া জগৎ চাহিয়া দেখিল সুধীর ডাক্তার। গ্রামে এই একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ এম. বি., অবশ্য 'ইতি গজে'র ন্যায় হোমিও। হাতে তাহার গৃহস্থ-চিকিৎসার বাক্সটি লইয়া সে এখন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়। আশেপাশের মধ্যে চার মাইল দূরে সরকারী ডাক্তারখানা, সেখানকার ডাক্তারকে ডাকিতে হইলে চার টাকা ভিজিট দিতে হয় এবং চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং এই অবকাশে সুধীর ডাক্তারের পশার বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে।

পাকী মদের একটা এগারো আউন্স বোতল আগাইয়া দিয়া জগৎ জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দিকে চলেছ ডাক্তার?

ডাক্তার বোতলটা গলায় ধরিয়া ঢকঢক করিয়া একদমে সেই আগুনের মত জলন্ত মদ সবখানি নিঃশেষ করিল। তারপর পকেট হইতে পয়সায় দুইটি দামের একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। লোকটি এসব বিষয়ে বিধিমত শৌখিন।

নেবে নাকি একটা সিগ্রেট?

না ভাই, বিলিতী কাগজ-পোড়া থেকে আমাদের দিশী শালপাতা অনেক ভাল। কান হইতে আধপোড়া বিড়িটা নামাইয়া ডাক্তারের জলন্ত কাঠিটার আগুনে জগৎ সেটাকে জ্বালাইয়া লইল।

তারপর চললে কোন্ দিকে?

ডাক্তার হিহি করিয়া হাসিল। বড় বড় কালো দাঁত, থইনি খায় নিশ্চয়। হাসিলে অনাবশ্যকভাবে তাহার মাড়ি দুইটা বিকশিত হইয়া পড়ে, অথবা দাঁতগুলি একটু বেশি উঁচু বলিয়াই হয়তো মাড়ির বন্ধনকে স্বীকার করিতে চায় না।

যাব আর কোন্ দিকে! ডাক তো চারিদিকেই আছে। গো-বদ্যির মত মানুষ যা মরতে সুরু করেছে দাদা! তা চলেছি বামুন-পাড়ার মুখো, টাকাকড়ি দু একটা যা হোক ওদিকেই আছে তো। চার আট আনায় আর মজুরি পোষায় না।

কাঁধ-ছেঁড়া খাকী মিলিটারী শার্টটার পকেট হইতে ডাক্তার কারে বাঁধা একটা ঘড়ি বাহির করিল। রেলওয়ে গার্ড-ওয়াচ—সাড়ে তিন টাকা দামে বছর পাঁচেক আগে শহর হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল। দৈনিক দুই এক ঘণ্টা স্লো হইতেছে বটে, তবু এখনও বেশ কাজ দেয়। গ্রামে এতটা সময়ানুবর্ত্তিতা না রাখিলেও চলে।

নটা বেজেছে। আজ আর সারারাত ঘুম নেই। এ বাড়ি
বাড়ি ঘুরতেই সকাল হয়ে যাবে। যাই একবার ওদিক পানে, ম
চাটুজ্জের খুড়ীর বোধ হয় হয়ে এল।

এক হাতে গৃহস্থ-চিকিৎসার বাক্স, আর এক হাতে ঘোড়া-চালা
রাইডার লইয়া সুধীর ডাক্তার অন্ধকারে নামিয়া গেল।

পিছন হইতে জগৎ হাঁকিয়া বলিল, আসবে নাকি আবার?

আসব মানে? তোমার ওপর ভরসা ক'রেই তো রাত জাগ
পারি ভায়া। কয়েকবারই আসতে হবে, দেখো, ঘুমিও না।

বাহিরের অন্ধকারে ডাক্তারের কাঁচা চামড়ার ভারী জুতার মস
শব্দ মিলাইয়া আসিল। দূরে কে যেন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে
কারা যেন বিকট কণ্ঠে হরিধ্বনি করিল! নামটা দেবতার, তবু শু
বুকের মধ্যে হিম হইয়া আসে।

বেশ রাত্রি হইয়া গিয়াছে, রীতিমত ক্ষুধাবোধ হইতেছে জগতে
কিন্তু মদের দোকানের পাই পয়সার হিসাব করিতে করিতে অতিরি
হিসাবী হইয়া উঠিয়াছে সে। তা ছাড়া কলেরা আরম্ভ হইবার
হইতেই তাহার সাবধানতা আরও বাড়িয়াছে। কোনও খাদ্যদ্রব্যে
সে আর বিশ্বাস করিতে পারে না।

ঘরের কুঁজা হইতে এক ঘটি জল এবং টিন হইতে এক কোঁচড় মু
লইয়া জগৎ চিবাইতে লাগিল। এ সময় নিতান্তই খালি পেটে থাকি
নাই, নতুবা এ বেলা বেশ উপবাসেই কাটাইয়া দেওয়া চলিত। সু
ডাক্তার রাত্রে যখন কয়েকবারই আসিবে তখন তাড়াতাড়ি ঘুমা
লাভ নাই। লোকটার যা স্বভাব, সময়মত মদ না পাইলে হয়
দরজা জানালা ভাঙিয়া বসিবে। জগৎ একটা লোহার চেয়ারে
হইয়া বসিয়া মুড়ি চিবাইয়া চলিল।

সংসারে তাহার কেহ নাই—আকর্ষণও কিছুই নাই এক রকম। তবু
জগৎ মরিতে ভয় পায়। মৃত্যু কেমন করিয়া আসে, সে কথা সে আজও
ভুলিয়া যায় নাই। বসন্ত, অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা, চোখের সামনে
অন্ধকারের আবরণ। তারপর রঘুবীর কালোয়ার, এবং—

অন্ধকারের মধ্যে বড় বড় পা ফেলিয়া সুধীর ডাক্তার আগাইয়া
চলিল। গ্রামের পথ—গরুর গাড়ির চাকায় চাকায় ক্ষত-বিক্ষত এবং
ধূলিধূসর হইয়া আছে। কাঁচা চামড়ার জুতার তলা হইতে ধূলার গন্ধ
উঠিয়া আসিয়া সুধীর ডাক্তারের নাক মুখ ভরিয়া দিতে লাগিল।

পথের পাশে পুরানো বড় দীঘিটা—জেলেরা এর মধ্যেই দীঘির
পাড়ে মড়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পচা মাংসের স্পষ্ট পরিচিত
গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিল, ওই তো শেয়ালের ঝগড়া শোনা যাইতেছে
—অনুমানটা তবে মিথ্যা নয়।

দূরে বাবলা-বনের মধ্যে দপদপ করিয়া আলেয়া জ্বলিয়া উঠিল।
লোকের বিশ্বাস, ওটা আলেয়া নয়। মা কালীর যে ডাকিনীরা সারা
গ্রামটাকে খাইয়া বেড়াইতেছে, ওটা হয়তো তাহাদেরই কাহারও জ্বলন্ত
চোখ।

মানুষ মরিতেছে—মৃত্যুর যেন উৎসব সুরু হইয়াছে। স্বাভাবিক-
ভাবে মরণ যখন আসে, তখন এটাকে কি আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়!
অথচ, আজ এই মুহূর্ত্তে যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের বাঁচিয়া থাকার
চেয়ে অস্বাভাবিক আর কিছুই নাই। শোকের মাত্রাকে ভয়ের মাত্রাটা
অনেকক্ষণ আগেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।

লণ্ঠনের ম্লান আলো ফেলিয়া ক্যাঁচক্যাঁচ করিতে করিতে দুইখানি

গরুর গাড়ি আম-বাগানের মধ্য হইতে ঠিক সামনে আসিয়া পড়িল। সুধীর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, কোথাকার গাড়ি হে ?

উত্তর আসিল, ইষ্টিশানে যাবে।

অর্থাৎ পলাইতেছে। আশ্চর্য্য—মানুষ মরিতে এত ভয় পায়, অথচ জীবনকে কতটুকুই বা বিশ্বাস করা চলে ? সাপে কামড়াইতে পারে, বাজ পড়িতে পারে, ফুড-পয়জন হইতে পারে, সামান্য একটু জ্বর ভাঙিয়া ইরিসিপেলাসে দাঁড়াইতে পারে। আর বাঁচিয়াই বা ইহারা পৃথিবীর কোন্ উপকারটা করিবে ? বাজারে তরি-তরকারি দুধ মাছের দাম বাড়াইবে বই তো নয়!

বাঃ, এই যে—এ বাড়িতে কোন সাড়াশব্দ নাই! জন দুই তিন মানুষ কাল অবধিও তো ছিল, আজ একদিনের মধ্যেই সাবাড় হইয়া গেল নাকি সব ?

বাড়িটা জুড়িয়া ঘন ঘুটঘুটে অন্ধকার—ভিতরে এক পা বাড়াইতে বীভৎস দুর্গন্ধের যেন একটা ঢেউ বহিয়া আসিল। দেশলাই জ্বালাইতেই—

সম্মুখে দাওয়ার উপরে আবর্জ্জনায় পরিকীর্ণ হইয়া একটি মেয়ে পড়িয়া আছে, মাথার কাছে এক ঘটি জল। বোধ হয় মৃত্যু-সময়ের কর্ত্তব্য পালন করিয়া বাড়ির আর সবাই পলাইয়া বাঁচিয়াছে। সুধীর ডাক্তার নাড়ী দেখিল—নাঃ, অনেকক্ষণ মরিয়াছে। অথচ, মৃত্যুর স্পর্শে মেয়েটির সৌন্দর্য্য এতটুকুও ম্লান হয় নাই, চোখ মুখ এতটুকুও বিকৃত হয় নাই। যেন অত্যন্ত সহজভাবে সে ঘুমাইতেছে, পরপুরুষের স্পর্শে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া এই মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিতে পারে।

সহসা ডাক্তারের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। এই মেয়েটি আর কয়

দিন বাঁচিলে, নিজের সহস্র সুখস্বপ্নকে কয়টি দিনের জন্য সার্থক করিয়া লইতে পারিলে, এত বড় বিশ্বসংসারে কাহার কতটুকু ক্ষতি হইত ?

না, দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া লাভ নাই। এমন মৃত্যু তো আজ ঘরে ঘরে। বরং ফেরার পথে ইহার দাহ করিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে।

এই যে—এ বাড়িতে মানুষ গোঙাইতেছে! এখনও চিকিৎসার সময় আছে, হয়তো। সুধীর ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। একটা ব্রিশের বোতল সঙ্গে থাকিলে এ সময়টাতে ভারী উপকার হইত।

আশেপাশের ঘরগুলি অন্ধকার—কাল পর্য্যন্ত এ বাড়িতে চারটি মানুষ মরিয়াছে। এ ঘরের একটা টিপয়ের উপর বাতি জ্বলিতেছে, বনমালী কাকাও তাহা হইলে পড়িয়াছেন। মাথার কাছে পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া বনমালীর বড় ছেলে রাজেন। ব্লিচিং পাউডারের অত্যুগ্র একটা গন্ধ আসিতেছে, একটু আগে খানিকটা কাপড়ও বোধ করি পোড়ানো হইয়াছিল। এ পরিবারটি শিক্ষিত এবং সাবধানী, কিন্তু শত শিক্ষা-দীক্ষাও এই মুহূর্ত্তে কোনও কাজে লাগে নাই।

জুতার শব্দে রাজেন মুখ তুলিল। অস্বাভাবিক স্বাভাবিক স্বরে বলিল, এস।

ডাক্তার নিরুত্তরে আগাইয়া গেল, রোগীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। আর বেশিক্ষণ নয়। তবু হোমিওপ্যাথিক বাক্সটা খুলিয়া সে একটা ছোট শিশি বাহির করিল। গোটাকয়েক বড়ি কাগজে ঢালিয়া রাজেনকে দিয়া কহিল, দু ঘণ্টা পর পর খাইয়ে দিও।

মনে হইল, রাজেন যেন হাসিল।

আর দু ঘণ্টাও কাটবে না ডাক্তার, তোমার বড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

সুধীর ডাক্তার কথা কহিল না, ওষুধের মোড়কটা টিপয়ের উপ
নামাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। ও ঘরের দাওয়ায় বসি
ভাঙা গলায় কে একটি মেয়ে কাঁদিতেছে। কাঁদিতেছে না তো, যে
যন্ত্রণার একটা গোঙানি তাহার গলার মধ্য হইতে ঠেলিয়া বাহি
হইতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁদার ক্ষমতাও বোধ হয় তাহার লো
পাইতেছে ক্রমশ।

অন্ধকার—দূরে বাবলা-বনের সেই আলেয়াটা সত্য সত্য
ডাকিনীর চোখের মত জ্বলিতেছে। মাথার উপর বটগাছের ডা
বাদুড় পাখা ঝটপট করিতেছে। কয়েকটা পাকা বটফল ডাক্তারে
গায়ে আসিয়া পড়িল, মুহূর্ত্তের জন্য চমকিয়া উঠিল সে। মৃত পুনর্ভব
রিক্ত বালুতটে শ্মশানকালীর ভাঙা মন্দিরটার গায়ে বসিয়া সে
শঙ্খচিলটা চীৎকার করিতেছে। গোয়ালাপাড়াটা বোধ হয় এতক্ষ
শেষ হইয়া গেল।

ঝম—ঝম—ঝম—

জগৎ চক্রবর্ত্তীর চমক ভাঙিল। মদের হিসাব করিতে করি
হঠাৎ তাহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া আসিল। বাহিরে কে হাঁটিতেছে ন
মনে হইতেছে, যেন অন্ধকারের মধ্য দিয়া কে হাঁটিয়া চলিয়াছে, মাং
চর্ম্মহীন দেহের হাড়গুলি তাহার বিচিত্র একতানে ঝমঝম করিয়া বাজি
উঠিতেছে।

মনে হইল, জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইলেই সে দেখিতে পা
একটা কঙ্কাল। একটা কঙ্কাল—সাদা কোটরের মধ্যে দু
অস্বাভাবিক চোখ বিড়ির আগুনের মত জ্বলিতেছে—অতি প্রকট
অস্থি-সংস্থানের মধ্যে মানুষের আদিমতম নির্লজ্জ রূপটা বাহির হ

পড়িয়াছে। বড় দীঘিটা খুব দূরে নয়। তাহার পাড়ে পাড়ে জেলেরা মড়া ফেলিয়া যায়, আসশ্যাওড়ার বন হইতে গুড়ি মারিয়া শেয়ালেরা বাহির হইয়া আসে, তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে দেহে আর রক্তমাংসের বালাই থাকে না।

জগৎ চক্রবর্ত্তীর গা ছমছম করিতে লাগিল। হাত বাড়াইয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল সে। অথচ ভয় পাইবার কি আছে! অন্ধকারের মধ্য দিয়া পাশের আম-বাগানের দিকে একটা সজারু চলিয়া গেল শুধু।

কিন্তু সজারু যদি না হয়? যদি সত্যই বড় দীঘির পাড় হইতে—? আর এমন কাহিনীও তো ঢের শোনা যায়।

গলায় হাত বাড়াইয়া পৈতাটা সে খুঁজিয়া দেখিল। গায়ত্রীমন্ত্রটাও এখনও তাহার মনে আছে।

আচ্ছা, পেটটা একটু কেমন কেমন করিতেছে না? কথাটা ভাবিতেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। বোধ হয় সুধার জন্যই। কিন্তু, কিন্তু মনে কর যদি তাহার কলেরা হয়?

কলেরা হইবে! কলেরা মানেই তো মৃত্যু! বার দুই তিন বমি হইবে, বার কয়েক ভেদ, তারপরেই বাস্! কে বা দেখিতে আসিবে তাহাকে? চারিদিকে যা রোগীর ভিড়—সুধীর ডাক্তার দিনান্তে মদের প্রয়োজনে একবার আসিতেও পারে, নাও আসিতে পারে। তারপর? তারপর তাহার দেহটা পচিতে থাকিবে। পেটটা ফুলিয়া উঠিবে, ঠোঁট নাক আর চোখ দুইটায় পিঁপড়া ধরিবে, দেহের মাংস গলিয়া গলিয়া—

জগৎ চক্রবর্ত্তী আর ভাবিতে পারিল না। মৃত্যু যে কি জিনিস, সে

অভিজ্ঞতা তাহার আরও একবার হইয়াছে। সংসারে তাহার না হ
কেহই নাই, কিন্তু তাই বলিয়া বাঁচিবার সুযোগ সে ছাড়িবে কেন?

কাহাকেও এক পয়সা দিতে হয় না, কেউ অংশীদার নাই, তাই
অনেকগুলি টাকা সে সঞ্চয় করিয়াছে। এ টাকায় কি হইবে, সে ক
সে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। কিন্তু ভাবিয়া তাহার কি লাভ? সে
সঞ্চয় করিবে, তার সঞ্চয়কে সে আগলাইয়া রাখিবে যক্ষের মত—
ইহাই তাহার সান্ত্বনা।

চক্রবর্ত্তী, বলি, ওহে চক্রবর্ত্তী!

চক্রবর্ত্তীর হাতটা বিদ্যুৎবেগে পৈতায় গিয়া পৌছিল। জানা
না খুলিয়াই সে প্রশ্ন করিল, কে?

একবারটি বাইরে এস না।

গলাটা কেমন একটু খোনা খোনা নয়? চক্রবর্ত্তী গায়ত্রী জ
করিতে লাগিল, উত্তর দিল না।

বামুনের মেয়ে মরেছে, একবার কাঁধ দিতে হচ্ছে যে।

মানুষটা চেনাই বটে, তবু বিশ্বাস নাই। ভূত না হয় নাই হইল
কিন্তু কলেরার মড়া তো।

অতএব কাঁপা গলায় সে জবাব দিল, আমার বড্ড জ্বর এসেছে
এবেলা আমায় মাপ করতে হবে হে।

এত অন্ধকার—একটা বাতি থাকিলে বড় ভাল হইত। পথে কি
দেখা যায় না। পানা-পুকুরের মধ্যে কচি ছেলের মত ইয়া ইয়া করি
কি একটা পাখি কাঁদিতেছে, ভূতের কান্না মনে করিলে দোষ হয় না।

বল হরি—হরিবোল—

হলদি বিলের দিক হইতে চীৎকার আসিতেছে। এখনও কি মানুষে

মড়া পোড়াইবার ধৈর্য্য অবশিষ্ট আছে নাকি? রাশি রাশি তালগাছের শিকড় যেখানে খাড়া মাটির পাড় ভাঙিয়া সোজা বিলের দুর্ভেদ্য কলমী আর পানার ভিতরে অদৃশ্য হইয়াছে এবং কাঁটায় ঘেরা লাটার বন যেখানে অসংখ্য গরুর হাড়ে আকীর্ণ, মুখে একবার আগুন ছোঁয়াইয়াই সেই কলমী-দামের নীচে বড় বড় বাঁশে করিয়া এখন মৃতদেহগুলি ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে নিশ্চয়ই।

হাঁটিতে হাঁটিতে সুধীর ডাক্তার সোজা আসিল মধুসূদন মুখুজ্জের বাড়িতে। ছেলে বিদেশে চাকরি করে, বাপের সঙ্গে সদ্ভাব নাই। বছর কয়েক বৎসর আগে স্ত্রী মরিয়াছে, সেই হইতে গোটা দুই চাকর লইয়াই মধুসূদন মুখুজ্জের কারবার। লোকটা অস্বাভাবিক কৃপণ। ছেলেকে তো তাড়াইয়া দিয়াছে, এখন এতগুলা টাকা কার ভোগে লাগাইবে কে জানে!

জল—জল—জল—

বিকৃত ভয়ঙ্কর চীৎকারে সুধীর ডাক্তার শিহরিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে একটা ময়লা দড়ির খাটিয়ায় পড়িয়া মধুসূদন মুখুজ্জে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এক পাশে একটা কেরোসিনের ডিবা কে যেন দয়া করিয়া জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে; কিন্তু তেল নাই, শিখাটা ক্রমশ ছোট হইয়া আসিতেছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হয়তো নিবিয়া যাইবে। কোথাও আর জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই; চাকর দুইটা সরিয়াছে, না মরিয়াছে, তাও বুঝিবার জো নাই।

পকেট হইতে রেলওয়ে গার্ড-ওয়াচটা বাহির করিয়া সুধীর ডাক্তার দেখিল, বারোটা বাজিয়াছে। পয়সায় দুইটা দামের আর একটা সিগারেট বাহির করিয়া সে ধরাইল। মৃত্যুর পক্ষে রাত বারোটা অত্যন্ত প্রশস্ত অবসর। ঝাঁক বাঁধিয়া কইমাছের মত এই সময়টাতেই মানুষ

মরিতে আরম্ভ করে। বনমালী কাকারও এক্ষণে হইয়া গেল বোধ হয়।

একটা অ্যালুমিনিয়ামের ঘটি হইতে খানিকটা জল সে মধুসূদনের মুখে ঢালিয়া দিল। মরিবার আগেই প্রেতমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে লোকটা। কালো কুশ্রী মুখ তাহার কদাকার হইয়া উঠিয়াছে, নাকটা বাঁ দিকে একটু ভাঙিয়া পড়িয়াছে, গলার ত্রিভুজাকৃতি হাড়টা নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের মত উঠাপড়া করিতেছে।

আবর্জ্জনায় ময়লা বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে, বদলাইয়া দিলে ভাল হয়। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো একটা দোলার দড়ির উপর এক গাদা কাপড়-চোপড় রহিয়াছে, গৃহস্থ-চিকিৎসার বাক্সটা নামাইয়া সুধীর ডাক্তার তাহারই কতকগুলা পাড়িয়া আনিল। তারপর বিছানাটা বদলানোর উপক্রম করিতেই—

স্প্রিঙের পুতুলের মত মধুসূদন মুখুজ্জে নক্ষত্রবেগে খাড়া হইয়া উঠিল। সজারুর কাঁটার মত কাঁচা পাকা চুলগুলি তাহার তীক্ষ্ণা হইয়া উঠিয়াছে, কোটরের মধ্য হইতে সাদা-পর্দ্দা-নামা ঘোলা চো দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। আর্ত্তকণ্ঠে 'জল' বলি একটা চীৎকার করিয়াই মুমূর্ষু রোগী খোলা দরজার পথে ছুটিয়া বাহি হইয়া গেল।

সুধীর ডাক্তারের চোখের সামনে কেরোসিনের ডিবাটা দপ করি নিবিয়া গেল। তারপরেই দুর্গন্ধময় কালো বিষাক্ত অন্ধকার। সুধী রোগীর সন্ধানে বাহিরে নামিয়া আসিল। কিন্তু কোথায় রোগী! দু অন্ধকারের আবরণ-ছায়ায় সে অদৃশ্য হইয়াছে। আচ্ছা, ওই—ওই— কলা-বাগানের মধ্যে কি একটা দেখা যাইতেছে না?

সমস্ত গ্রাম ভরিয়া মৃত্যুর অরাজক লীলা—এই নিরালোক রা

রাত্রিতে ভয়ার্ত্ত গ্রামের উপর সে সমস্ত মরা মানুষের অশরীরী আত্মাগুলি এমনই করিয়া মধুসূদন মুখুজ্জের মত অতৃপ্ত পিপাসা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে হয়তো। কতজনেই যে 'জল জল' করিয়া মরিয়াছে, অসহ্য তৃষ্ণা লইয়া পৃথিবীর বুক হইতে বিদায় লইয়াছে, এত সহজেই কি তাহারা পার পাইবে? সুধীর ডাক্তারের মনে হইল, তাহার আশে-পাশে ফোঁস ফোঁস করিয়া যেন কাহাদের উত্তপ্ত নিশ্বাস ঝরিয়া পড়িতেছে।

কলা-বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিতেই মধুসূদন মুখুজ্জেকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল। একটা কলাগাছকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মধুসূদনকে স্পর্শ করিয়াই ডাক্তার সরিয়া আসিল। লোকটা মরিয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার বজ্র-আলিঙ্গন শিথিল হয় নাই, যেন এই গাছটার আশ্রয় লইয়াই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে সে জীবনকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল।

সুধীর ডাক্তার বহু শ্রমে তাহাকে খুলিয়া আনিল; কিন্তু এত বড় দেহটা বহিয়া লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্ধকার কলা-বাগানের পাতায় পাতায় মৃত প্রেতাত্মারা যেন নিশ্বাস ফেলিতেছে। দূরে দূরে এক একটা কান্নার শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন সাড়া নাই। বড় দীঘিটার পাড়ে শিয়ালেরা মারামারি করিতেছে—মাঝে মাঝে রাত্রির স্তব্ধতার উপর দিয়া পিশাচের কলরবের মত তাহা ভাসিয়া আসিতেছিল।

মধুসূদন মুখুজ্জের দেহটা সে মাটিতে শোয়াইয়া রাখিল—কোমরের চাবির তাড়াটা তাহার হাতে লাগিয়া ঝনঝন করিয়া উঠিতেছে। ইচ্ছা করিলেই সে এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত যখের ধন—

হাসি পাইতেছে তাহার।

কাল সকালে যে কেহ লোকটার একটা ব্যবস্থা করিবে। কেউ কিছু না করিলেও ক্ষতি নাই। বাঁচিয়া থাকিয়া লোকটা সংসারে কাহারও এতটুকু উপকারে আসে নাই, মরিয়া শেয়াল-কুকুরের ক্ষুধা মিটাইবে অন্তত।

জগৎদা, ও জগৎদা!

লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশী মদের কাউন্টারে বসিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে জগৎ উঠিয়া বসিল। জাপানী বি-টাইম্‌পিসে তিনটা বাজিতেছে। দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, একেবারে রাত শেষ ক'রে এলে যে?

সুধীর ডাক্তার পকেটে হাত দিয়া পয়সায় দুইটা দামের একটা সিগারেট খুঁজিল, কিন্তু অনেক আগেই সেগুলি নিঃশেষ হইয়াছে। কহিল, একটা বিড়ি দাও দাদা, তোমার দিশী শালপাতাই একটু পোড়ানো যাক। আর পুরো একটা বোতল খুলে দাও,—পাঁইটে কুলোবে না।

বোতল খুলিয়া দিয়া জগৎ কহিল, রাত একেবারে কাবার! খুব রোজগার ক'রে এলে বুঝি?

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়া ডাক্তার বাঁ হাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে টাকা বাজাইল। কহিল, হুঁঃ, রোজগার তো কানাকড়ি। মানুষ ম'রেই দিশে পাচ্ছে না, তা দেবে টাকা! বোসের বাড়ির বউটার একটা বন্দোবস্ত ক'রে আসতে আসতেই রাত শেষ হয়ে গেল।

জগৎ চক্রবর্ত্তী সরিয়া বসিল। সুধীর ডাক্তারের এতটা কাছে সরিয়া বসাটা সে মনের দিক হইতে সমর্থন করিতে পারিতেছে না। রাজ্যের কলেরার রোগী ঘাঁটিয়া আসিয়াছে, সঙ্গে কি পরিমাণে বীজাণু বহিয়া আনিয়াছে, তাই বা কে বলিবে?

সুধীর ডাক্তারের আমেজ আসিতেছিল। রাত্রির বিনিদ্র পরিশ্রম এবং মদের প্রভাব, তাহার চিত্তবৃত্তিকে অকস্মাৎ বিচিত্র রকমে লঘু করিয়া আনিয়াছে। কহিল, একটা গান গাও না ভাই, সেই হারাধন অপেরা পার্টিতে বিবেক সেজে যে গানটা তুমি গাইতে।

জগৎ সে অনুরোধে কান দিল না। সংক্ষেপে কহিল, মদের দামটা সঙ্গে আছে তো?

সুধীর ডাক্তার পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া ঝাড়িল, একটা টাকা এবং গোটা কয়েক সিকি, আধুলি ঝরিয়া পড়িল ঝনঝন করিয়া।

যা হয়, ওর থেকে গুনে নাও। হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি। শুনলে তুমি নিশ্চয় খুশি হবে।

বীভৎস কুশ্রী মুখে ডান চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ করিয়া জগৎ চক্রবর্ত্তী বলিল, কি কথা?

জান তো, বাড়িতে আমার বিধবা মায়ের কি কষ্ট? তাই মা চিঠি লিখছেন—আসছে বোশেখেই কার এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিকঠাক। বেশ রঙিন আর রসাল ক'রে তোমাকে একটা প্রীতি-উপহার লিখে দিতে হবে ভাই, যাত্রার দলে চাকরি ক'রে তোমার তো আবার কবিতা-টবিতা আসে।

অখণ্ড মনোযোগ দিয়া পয়সা-কড়িগুলা গুনিতে গুনিতে নিঃসঙ্গ, নিরাত্মীয়, প্রবীণ জগৎ চক্রবর্ত্তী কহিল, আচ্ছা।

পূবের আকাশ সাদা হইয়া আসিয়াছে। দিগন্তে বিভীষিকাঘন আর একটি মহামারীর দিনের আভাস।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"যাবার সময় হ'ল"

ঘটনা কিছুই নহে তেমন বিশেষ—
স্থান ভগ্ন পদ্মাতীর, কাল বেলাশেষ ;
যাত্রীদের ভিড় অল্প ষ্টীমারের ঘাটে,
দোকানে দোকানী দীপ জ্বালাইল হাটে।
শোনা গেল ম্লান মুখে বহু-পুরাতন
"যাবার সময় হ'ল"—সংক্ষিপ্ত ভাষণ।

স্তিমিত-প্রদীপ গৃহে অলস শয়নে
সেই ছোট কথা কটি যবে আনি মনে—
কত প্রাতে কত সাঁঝে কত পথে ঘরে
কত বিদায়ের ক্ষণে হাতে হাতে ধ'রে
কত ম্লান মুখ হতে এই কটি কথা
কতবার বাহিরিল, কেমনে কব তা!
সন্ধ্যার নদীর 'পরে বহে ঝিরি ঝিরি
যে বাতাস, নাহি জানি লইতেছে ফিরি
কত কোটিবার-বলা "সময় হইল"—
নভোবীণা তারি সুরে তার বাঁধি নিল।

বিদেশে যাইবে পুত্র, সারাদিন তার
আয়োজনে অবসর নাহিক মাতার ;
এটা রাঁধে ওটা রাঁধে, নাহি মেটে সাধ—
কোন্ সে ব্যঞ্জন যাতে ছেলে পায় স্বাদ!
ধীরে বেলা প'ড়ে আসে, সময় ঘনায়,
ক্রমে দূরে ষ্টীমারের বাঁশী শোনা যায়—
সে বংশী কাঁদিয়া ফেরে অন্তরীক্ষে জলে,
জননীর বক্ষমাঝে অশ্রু যে উথলে।

আজ রাত্রে হেথা বসি কেবলি শুনি রে—
"যাবার সময় হ'ল" বাহির-তিমিরে
অবিরাম জপিতেছে অণু পরমাণু।
সেই তালে ছুটে চলে শত কোটি ভানু,
সেই তালে নিদ্রালীন অর্দ্ধেক ধরাতে
জীবনের হৃৎপিণ্ড নাচে এই রাতে,
আলোকিত অপরার্দ্ধে কর্ম্ম-মুখরিত
সেই সুরই উঠিতেছে উদাত্ত স্বরিত।
সূর্য্যাস্ত হইল যেথা প্রান্তরে নগরে
শঙ্কিত প্রেমিক যেথা একান্তে বিহরে,
শতাব্দী-সমান গনে একটি নিমেষ,
তারি তরে যেবা যেথা বিনাইছে কেশ,
প্রতীক্ষা ও প্রসাধন, ত্রস্ত পলায়ন,
তরুশ্রেণী-অন্তরালে সতর্ক ভ্রমণ,
চিরেপ্সিত আশ্লেষণ,
তারও মর্ম্মমূলে
"যাবার সময় হ'ল" এই ধ্বনি তুলে
অবসর নাহি দেয় দুদণ্ড রাখিতে,
নয়ন-হ্রদের তলে আত্মারে দেখিতে,
ক্ষণতরে নামাইতে জীবনের ভার,
উষ্ণ কর-তলে প্রাণ-স্পর্শ লভিবার।

হে বিশ্ব, তোমায় নমি। যাবার সময়
চিরদিনই হয় যেন। ছিন্ন যদি হয়
হৃদয়ের যত গ্রন্থি, করুণা ক'র না,
পলাইছে যে তাহার আঁচলে ধ'র না।
কল্প হতে কল্পান্তরে যে প্রস্থান-খেলা
তাহারি তরঙ্গ ভেঙে ভুবনের মেলা,
নক্ষত্র-আকীর্ণ ঐ গগন-চত্বরে
তারি সাথে যোগ দিতে হবে যে, চিত্ত রে,

বাতায়ন খুলি এই অস্তিত্ব-কারায়
পূর্ণ করি নিতে হবে অজস্র ধারায়
প্রস্থানের গানে।

তবে সেই ঘণ্টাধ্বনি—
মহাকায় সরীসৃপ-দল যাহা শুনি
পলাইল ; পিরামিড রচিল যাহারা
নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া হ'ল চিহ্নহারা ;
যাহা শুনি শরতের প্রথম বাতাসে
পীতপত্র দলে দলে পলায় তরাসে,
বসন্তে ফুটিয়া-ওঠা ফুল দ্রুতগতি
যাহার তাগিদে ঝরে, না শুনি মিনতি ;
কুমার কিশোর-মুখ যাহার তাড়ায়
কোমল মাস্পণ্য তার দুদিনে হারায়—
দেরি নাহি করে, নাহি মানে অনুনয়—
সে ঘণ্টার বাণী লব হৃদয়ে নির্ভয় ;
প্রোথিত না রব আর ধরার ধূলিতে,
যাত্রার হর্ষের সুরা টানি লব চিতে।

পদ্মার সে ম্লান মুখ যেখানে ঘুমায়
আজ রাত্রে, মোর শ্লোক অজস্র চুমায়
আচ্ছন্ন করুক তারে। দ্বারখানি খোল,
"যাবার সময় হ'ল" আরবার বল॥

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (চাঁদপুর

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, বাংলা-সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ মুষ্টিমেয় যে-কয় জন বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ওরফে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য (খর্ব্বাকৃতির জন্য) অন্যতম। কিন্তু অদ্যকার দিনে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পারা গিয়াছে, আপাততঃ তাহাই আমাদের সম্বল।

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (১৩২৪) পুস্তকে গৌরীশঙ্করের বাল্যজীবন সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিতে পারিয়াছেন, তাহা এই :—

গৌরীশঙ্কর ইটার পক্ষগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য। জগন্নাথের দুই পুত্র শ্রীনাথ ও গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্কর গৌরবর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি পুরুষ ছিলেন।

গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই গৌরীশঙ্করের ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তিনি যখন কিশোরবয়স্ক পিতা জগন্নাথ তখন পরলোক গমন করেন। পিতৃবিয়োগে গৌরীশঙ্কর অত্যন্ত বিষাদিত হন এবং একদা রাত্রিযোগে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপ গমন করেন। তখন গৌরীশঙ্করের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, পঞ্চদশ-বর্ষীয় বালক অপরিচিত নবদ্বীপে জনৈক অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইয়া ন্যায়াধ্যয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তৎকালে দেশে বিদ্যার্থীর অর্থের অভাব ছিল না, অধ্যাপকবর্গ ছাত্রের আহার দিতেন, দেশের জমীদারবর্গ হইতে তাঁহারা সাহায্য পাইতেন।

গৌরীশঙ্কর নিরুদ্বেগে নবদ্বীপে ন্যায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ও অসাধারণ

প্রতিভাবলে অল্প কাল মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন, তাঁহার যশঃপ্রভা কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

গৌরীশঙ্কর যথাকালে অধ্যাপক হইতে "তর্কবাগীশ" উপাধি লাভ করেন এবং কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির পরামর্শে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় অল্পকাল মাত্র অবস্থিতির পরেই তিনি শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সহিত পরিচিত হন, গুণগ্রাহী কমলকৃষ্ণ তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি, ও শোভাবাজারের বালাখানায় বাসের জন্য একটি বাটিকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।—৩য় ভাগ, পৃ. ৩৪-৩৬।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি রচনা হইতে গৌরীশঙ্করের প্রথম জীবন সম্বন্ধে আরও দুই-চারিটি সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

…মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যখন কলিকাতায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অগ্রগণ্য, সেই সময় আমার ন ঠাকুরদাদার এক ছাত্র আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জোটেন। ইঁহার নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য। ন ঠাকুরদাদা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যকে পালন করেন। কিছুদিন রামমোহন রায়ের সঙ্গে থাকিয়া অনেক বিষয়েই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তিনি উঁহাকে ত্যাগ করেন ও ব্রহ্মসভার বিরোধী যে ধর্ম্মসভা ছিল তাহাতেই উপস্থিত হন ও তাহার কর্ত্তা নন্দ… ঠাকুরের দক্ষিণহস্ত হইয়া উঠেন। গৌরীশঙ্কর বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের নাম আপনাদের অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। তিনি 'সম্বাদ-ভাস্কর', 'রসরাজ' প্রভৃতি বাঙ্‌লা কাগজের সম্পাদক হইয়া খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। গৌরীশঙ্করের গুরুভক্তির বিশেষ অভাব ছিল না। আমাদের বাড়ীর কেহ কখনও কলিকাতায় আসিলে তিনি মহা সমারোহে তাহাকে কলিকাতার বাড়ীতে লইয়া যাইতেন ও বৎসর বৎসর ৺পূজার সময় আমার ন ঠাকুরমাকে ৺পূজার প্রণামীর টাকা ও কাপড় পাঠাইয়া দিতেন।—বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন, ১৪শ অধিবেশন, রাধানগর। কার্য্যবিবরণ, পৃ. ২৬।

গৌরীশঙ্কর কলিকাতায় অবস্থানকালে দক্ষিণারঞ্জন (তৎকালে

'দক্ষিণানন্দন') মুখোপাধ্যায়ের সুনজরে পড়েন। তিনিও ক্রমশঃ দক্ষিণারঞ্জনের অতীব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। বর্দ্ধমানের পরাণবাবু ও তদীয় পরিবারবর্গের সহিত বিবাদের ফলে "স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী ফৌজদারী সম্পর্কীয় ত্তির প্রাপণার্থ" গৌরীশঙ্করকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।* দক্ষিণারঞ্জনেরই সুপারিশে গৌরীশঙ্কর এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার পাইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে দক্ষিণারঞ্জন যখন "রাণী বসন্তকুমারীকে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া কলিকাতার পুলিস্ ম্যাজিষ্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে Civil Marriage নামক বিবাহ করেন", তখন গৌরীশঙ্কর তাহার সাক্ষী থাকেন।†

১৮ জুন ১৮৩১ তারিখে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় "ইয়ং বেঙ্গল"দের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র প্রকাশ করিলে, প্রুফ-সংশোধনাদি যাবতীয় সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকেই নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া সমসাময়িক সংবাদপত্র—'সমাচার তিমিরনাশক' লিখিয়াছিলেন :—

…শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে ক্ষতি নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহের কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট মজুমদারিকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকার

* এ বিষয়ে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের পত্র দ্রষ্টব্য।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯-৭১।

† 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত', (১৩১৫), পৃ. ১১৯।

মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

'জ্ঞানান্বেষণে'র পর গৌরীশঙ্কর আরও তিনখানি সাময়িক-পত্র পরিচালন করিয়া গিয়াছেন—সে সকল কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। এখানে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তিনি সাংবাদিক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন এক জন নির্ভীক সম্পাদক, তাঁহার রচনা সহজ সরল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ছিল। কলিকাতার খ্যাতনামা সাপ্তাহিক পত্র—'ক্যালকাটা কুরীয়ার' তাঁহার সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন :—

> His writings, as far as we have been able to judge, are always characterized by good sense and a vigorous style. Being free from the trammels of Hindoo superstition, he gladly embraces every opportunity of exposing the folly of his bigotted countrymen, and showing the great utility of cultivating European knowledge.

গৌরীশঙ্কর কিরূপ উদারমতাবলম্বী ছিলেন, সে-সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন যখন কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন গৌরীশঙ্কর এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

> আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আর সম্প্রতি যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যখাক্রড় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত,…এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র কি লক্ষ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব,…।—'সম্বাদ ভাস্কর', ২৩ মে ১৮৪৯।

নানা সভা-সমিতি ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত গৌরীশঙ্করের যোগ ছিল। সে-যুগে রাজকার্য্যাদি-সংক্রান্ত বিষয়—যাহাতে দেশের হিতানিষ্ট সম্পর্ক আছে—রীতিমত আলোচনার জন্য যে-সকল সভা গঠিত হয়, তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথম বলিতে হইবে। এই সভার সহিত গৌরীশঙ্করের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; তিনি কয়েক বার এই সভার সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যকে তিনি পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্র-পরিচালন

গৌরীশঙ্কর একাধিক সংবাদপত্র পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক বলিয়া সে-যুগে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি কম ছিল

না। তাঁহার পরিচালিত পত্রগুলির বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাং সাময়িক-পত্র' গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। সেগুলি যথাক্রমে এই :—

১। 'জ্ঞানান্বেষণ' ২। 'সম্বাদ ভাস্কর' ৩। 'সম্বাদ রসরাজ' ৪। 'হিন্দুরত্ন কমলাকর'।

রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ

গ্রন্থকার হিসাবেও গৌরীশঙ্করের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা বা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকালসমেত নিম্নে সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল।—

১। **ভগবদ্গীতা**—৯ম অধ্যায় পর্য্যন্ত। প্রকাশকাল—১২১৮ সাল (ইং. ১৮৩৫)।

২। **ভগবদ্গীতা**—সমগ্র অংশের অনুবাদ। প্রকাশকাল—ই ১৮৫২।

৩। **জ্ঞানপ্রদীপ,** ১ম খণ্ড। বালকদিগের শিক্ষার্থ বিবি বিষয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত সকল। প্রকাশকাল—২০ আষাঢ় ১২৪ (জুলাই ১৮৪০)।

৪। **জ্ঞানপ্রদীপ,** ২য় খণ্ড। প্রকাশকাল—১৬ মাঘ, ১২৫ (২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩)।

৫। **ভূগোলসার**—পৃথিবীর আকার ও বিবরণাদি নিরূপক নান গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপ সংগ্রহ। প্রকাশকাল—২৫ কার্ত্তিক ১২৬০ (নবেম্বর ১৮৫৩)।

৬। **নীতিরত্ন**। প্রকাশকাল—১১ জুন ১৮৫৪ (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১), পৃ. ৯৬।

৭। **মহাভারত,** ২য় খণ্ড। "উদ্যোগ পর্ব্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত। বঙ্গ ভাষা পদ্য কাশীদাস রচিত। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সংশোধিত।...সন ১২৬২ সাল পৌষ।"

মহাভারতের এই শেষ খণ্ডটি প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম খণ্ড—আদি হইতে বিরাট পর্ব্ব—পরে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।

৮। **চণ্ডী**। মূল ও গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশাদি টীকাকারগণ-সম্মতা টীকা সহিত। প্রকাশকাল—১ বৈশাখ ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮)।

* * *

পাদরি লং এবং আরও কেহ কেহ 'পাকরাজেশ্বর' গ্রন্থের রচয়িতা-হিসাবে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার রচয়িতা ছিলেন—বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার; গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ১২৬০ বঙ্গাব্দে "বর্দ্ধমানাধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাধিরাজ মহতাপ চন্দ্ বাহাদুরের আদেশমতে শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক সংশোধিত" হইয়া পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত হয়।

* * *

গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদসার' পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাধাকান্ত দেবের বৈঠকখানা। দেখিলেই মনে হয়, বড়লোকের বৈঠক। কয়েকটি মহার্ঘ চেয়ার ছাড়া একটি প্রকাণ্ড চৌকির উপর প্রশস্ত ফরাশ বিছানো রহিয়াছে। ফরাশের উপর দামী গালিচা এবং কয়েকটি মখমলের তাকিয়া দেখা যাইতেছে। রাধাকান্ত দেব একটি তাকিয়া হেলান দিয়া গড়গড়ায় তামাকু সেবন করিতেছেন। ফরাশের উপর একটু দূরে তর্করত্ন, বিদ্যাবাগীশ, তর্কালঙ্কার, ন্যায়রত্ন, চূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বসিয়া আছেন

রাধাকান্ত। সামনাসামনি এর বিচার হওয়াই ভাল। আপনাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, ওকেই বলুন, এখনই আসবে ও।

তর্করত্ন। নিশ্চয় বলব, ভয় করি নাকি কাউকে?

রাধাকান্ত। যাই বলুন আপনারা, ওর বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রবন্ধ প'ড়ে বিস্মিত হয়েছি আমি। ছোকরার 'বিদ্যাসাগর' উপাধি সার্থক!

ধোঁয়া ছাড়িলেন

বুদ্ধিমান যে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

বিদ্যাবাগীশ। আপনার যে সন্দেহ থাকবে না, তাতে আর বিস্ময়ের কি থাকতে পারে! কি বল হে ন্যায়রত্ন, সজ্জন সকলকেই সজ্জন মনে করে, বুদ্ধিমান সকলকেই বুদ্ধিমান ভাবে, কি বল হে চূড়ামণি?

চূড়ামণি। কি আর বলব বল!

ন্যায়রত্ন। কত অকালকুষ্মাণ্ড যে রসালত্ব প্রাপ্ত হ'ল এঁর হাতে, তা

আর কহতব্য নয়। সেদিন কথা নাই, বার্তা নাই, এক ছোঁড়া এসে ফড়ফড় ক'রে খানিক ইংরিজী আউড়ে হুহু ক'রে খানিক কেঁদে দিলে; বাস্, অমনই তার কলেজে পড়বার বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

রাধাকান্ত। কি যে বল! সে বেচারা সত্যিই ভাল ছেলে, সত্যিই গরিব।

তর্কালঙ্কার গলা-খাঁকারি দিলেন

তর্কালঙ্কার। বিরাট একটা মহীরুহ, অসংখ্য তার ডালপালা, বসুক না বাপু, পাঁচটা পক্ষী এসে। তোমাদের তাতে এত গাত্রদাহ কেন? দাহই যদি হয়, শীতল ছায়াতে আর একটু স'রে ব'স না, ছায়ার তো অভাব নেই।

বিদ্যাবাগীশ। তর্কালঙ্কার কি বুঝতে কি বুঝলে দেখ! গাত্রদাহের কথা নয়, অপাত্রে দান করাটা শাস্ত্রেই যে মানা করেছে, কি বল হে ন্যায়রত্ন? এই পরশু-দিনের ঘটনাটাই ধর না, লিকলিকে ওই বামুন ছোঁড়া যে একটা সংস্কৃত শ্লোক ব'লে দশ দশটা টাকা নিয়ে গেল, শ্লোকটা কি ওর নিজের তৈরি? কি বল হে চূড়ামণি?

রাধাকান্ত। শ্লোকটি কিন্তু বড় কবিত্বপূর্ণ। মনে আছে কারও?

ন্যায়রত্ন প্রথমে চক্ষু মিটিমিটি করিয়া পরে চক্ষু বুজিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিলেন

ন্যায়রত্ন। না, বাক্যগুলি স্মরণ করতে পারছি না। তবে অর্থটা হচ্ছে যে, আমার অন্তরস্থিতা বাণী এই সভায় আবির্ভূতা হতে কুণ্ঠিতা হচ্ছেন, কারণ তিনি নগ্না, আমার দারিদ্র্যের অনলে তাঁর বসন দগ্ধ হয়েছে। ভাবটি উত্তম, সে বিষয়ে সন্দেহ কি!

তর্করত্ন। [হাই তুলিলেন] তারা তারা তারা।

তর্কালঙ্কার। বিদ্যাসাগর কতক্ষণে আসবে কে জানে!

রাধাকান্ত পিরানের পকেট হইতে একটি সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন

রাধাকান্ত। সাতটার সময় তাকে আসতে বলেছি। এখনই আসে সে, আর মিনিট পাঁচেক দেরি আছে সাতটা বাজতে।

বিদ্যাবাগীশ। আপনি কি ওকে জানিয়েছেন যে, আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে হবে?

রাধাকান্ত। না, আমাকে এসে সেদিন বলছিল যে, আপনি বিধবা-বিবাহ যাতে প্রচলিত হয়, তার একটা ব্যবস্থা করুন, তাই আমি ডেকেছি আজকে তাকে।

চূড়ামণি। একটা অর্ব্বাচীনের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করাটাই আমাদের সম্মান-হানিকর।

রাধাকান্ত। নিতান্ত অর্ব্বাচীন নয় হে, ওর প্রস্তাবটা প'ড়ে দেখেছি ভাল ক'রে?

চূড়ামণি। [সবিস্ময়ে] আপনি কি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেন নাকি তা হ'লে?

রাধাকান্ত। বিবাহ সমর্থন না করলেও যুক্তিটা সমর্থন করি। আপনারা পারেন তো খণ্ডন করুন না যুক্তি।

বিদ্যাবাগীশ। আসল কথা কি জান? যুক্তি নিজেই উনি খণ্ডন করতে পারেন—

তর্কালঙ্কার। স্বচ্ছন্দে।

বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু পারছেন না চক্ষুলজ্জাবশত, কি বল হে তর্করত্ন? অপ্রিয় কার্য্যটা আমাদের দিয়ে করিয়ে নিতে চান। বুঝছ না?

বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাধাকান্ত। [উঠিয়া বসিয়া] এস, এস। ব'স।

বিদ্যাসাগর একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল

বিদ্যাসাগর। আমাকে ডেকেছেন কেন?

রাধাকান্ত। তোমার প্রস্তাবটির সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করতে চাই। এঁরাও রয়েছেন, সবলেই শাস্ত্রজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করবার মত বিদ্যে আমার নেই। তা ছাড়া, শাস্ত্রে যদি বিধবা-বিবাহের কোন বিধান নাও থাকত, তা হ'লেও আমি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করতে চেষ্টা করতাম।

রাধাকান্ত। [সবিস্ময়ে] তাই নাকি?

বিদ্যাবাগীশ। এই যদি তোমার মনের কথা, তা হ'লে শাস্ত্রীয় বচনের ভুল ব্যাখ্যা ক'রে ধার্ম্মিক লোকদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি না করাই উচিত ছিল তোমার, কি বল হে চূড়ামণি?

বিদ্যাসাগর। ভুল ব্যাখ্যা! কোন্‌টা ভুল ব্যাখ্যা?

চূড়ামণি। আগাগোড়াই ভুল। পরাশরসংহিতার বিবাহ-বিধায়ক উক্ত বচনটির অভিপ্রায় এই যে, যদি কোন বাগ্‌দত্তা কন্যার বর অনুদ্দেশাদি হয়, তা হ'লেই তার পুনরায় অন্য বরে বিবাহ হতে পারে। বিবাহিতা বিধবাদির বিবাহ হতে পারে—ও বচনের এরূপ অভিপ্রায় কদাচ নয়।

বিদ্যাসাগর। শ্লোকের মধ্যে তো বাগ্‌দত্তা কথার কোনই উল্লেখ নেই, কষ্টকল্পনা ক'রে বাগ্‌দত্তা আনবার প্রয়োজন কি? তা ছাড়া ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য তো এ বিষয়ে পরিষ্কার ক'রে লিখে দিয়েছেন, তিনি নিজে বিধবা-বিবাহ-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনিও অঙ্গীকার করেছেন যে, পরাশরের ওই বচনটি বিধবা-বিবাহ-বিধায়ক। নারদ-সংহিতা আরও সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন—

চূড়ামণির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল

চূড়ামণি। কি, আমার কথার ওপর কথা! আমি বলছি, ও শ্লোক বাগ্‌দত্তা-বিষয়ক, তুমি তা অপ্রমাণ কর।

তর্কালঙ্কার। থাম থাম, আমি একটি প্রশ্ন করি। ওই পরাশর-সংহিতাতেই বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ আছে, তা দেখেছ?

বিদ্যাসাগর। দেখেছি

বিদ্যাবাগীশ। তবে? বিধবারা কি বিবাহিতা স্ত্রী নয়?

বিদ্যাসাগর। কি মুশকিল, বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ তো নিষিদ্ধই, কেন নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ—এ পাঁচটি স্থলে পরাশর বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের বিধান দিচ্ছেন। বাগ্‌দত্তার কথা বলছিলেন? কাশ্যপবচনে বাগ্‌দত্তারও পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ, শাস্ত্রের কি কিছু ঠিক আছে?

তর্করত্ন। কিন্তু আদিত্যপুরাণে? আদিত্যপুরাণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

উঢ়ায়াং পুনরুদ্বাহং, জ্যেষ্ঠাংশং, গোবধং তথা
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্।

রাধাকান্ত। কমণ্ডলু-ধারণ মানা নাকি কলিতে?

তর্করত্ন ঘাড় নাড়িলেন

বিদ্যাসাগর। শুধু আদিত্যপুরাণ কেন, ক্রতু, বৃহন্নারদীয় এসব গ্রন্থে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। পরাশরও তা মানেন, কিন্তু তিনি পাঁচটি স্থল ধ'রে বিধান দিচ্ছেন যে, এই এই ক্ষেত্রে বিবাহিতা স্ত্রীরও পুনর্বিবাহ হতে পারে। আদিত্যপুরাণ, ক্রতু, বৃহন্নারদীয় এঁদের বিধি সামান্য বিধি অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম, কিন্তু পরাশরের বিধি বিশেষ বিধি, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সামান্য বিধি লঙ্ঘন করা যেতে পারে, তারই বিধি।

বিদ্যাবাগীশ। দেখ, তোমার ওসব মনগড়া যুক্তি তোমার মনেই নিবদ্ধ রাখ, ওসব আমরা শুনতে চাই না।

চূড়ামণি। ওসব শোনাও গিয়ে তোমার তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে, যে তোমার অনুগ্রহে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়েছে। সে তোমার সব কথায় হাঁ হাঁ ক'রে সায় দেয় ব'লে আমরা তা পারব না।

বিদ্যাসাগর। কটূক্তি কিম্বা উপহাস যুক্তি নয়। আচ্ছা, আমি উঠি এবার।

উঠিবার উপক্রম করিলেন

রাধাকান্ত। সেকি, ব'স ব'স, কোন আলোচনাই তো হ'ল না!

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি যা জানি বললাম, তা মানা, না মানা এখন আপনাদের ইচ্ছে। তা ছাড়া আমি তো আগেই বলেছি, শাস্ত্রে আছে—এই আমার প্রধান যুক্তি নয়। আমার আবেদন আপনাদের হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে।

রাধাকান্ত। ঠিক।

তর্কালঙ্কার। প্রত্যেক লোক যদি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা বুদ্ধির কৌশল অনুসারে চলে, তা হ'লে তো সমাজ দুদিনে উৎসন্ন যাবে। এই সব দমন করবার জন্যেই তো শাস্ত্র, যা শাসন করে—

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রও যুগে যুগে বদলেছে, কারণ শাস্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়।

রাধাকান্ত। নিঃসন্দেহে

বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু যে মানুষ শাস্ত্র বদলাতে সক্ষম, সে মানুষ এ দেশে জন্মায় নি এখনও, কি বল হে ন্যায়রত্ন?

চূড়ামণি। অন্তত বীরসিংহায় জন্মায় নি

বিদ্যাসাগর কোন জবাব দিলেন না

রাধাকান্ত। আপনারা চুপ করুন। [বিদ্যাসাগরকে] খোলসা ক'রে বল দিকি, কি চাও তুমি ?

বিদ্যাসাগর। বলেছি তো, সমাজ-সংস্কার। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা তার একটা দিক মাত্র।

রাধাকান্ত। সমাজ-সংস্কারের অন্য দিকও তো আছে, তার জন্যে কি করছ ?

বিদ্যাসাগর। আমি একা কতটুকু করতে পারি, আপনারা সবাই মিলে না করলে ? আমাদের সমাজে বিধবাদের অসীম দুর্গতি, সমাজ থেকে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে, সবই তো জানেন আপনারা।

তর্কালঙ্কার। আহা, এসব আর নতুন কথা কি ? সব সমাজে ব্যভিচারিণী চিরকাল আছে, সহসা তাদের দুঃখে এতটা বিচলিত হওয়ার অর্থ কি ?

বিদ্যাবাগীশ। অর্থ আছে বইকি, আমরা বুড়ো হয়েছি আমরা তার কি বুঝব, কি বল হে চূড়ামণি ? দাও, নস্যটা দাও।

নস্য লইতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা, আমি এবার উঠি।

রাধাকান্ত। ব'স ব'স। দেখ, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করা উচিত হ'লেও সহজ নয়।

বিদ্যাসাগর। সহজ নয় ব'লেই তো আপনার মত শক্তিশালীর উপযুক্ত কাজ—

ন্যায়রত্ন। এ কথাটা ঠিকই বলেছ। উনি যদি এতে নামেন, এখনই সব ঠিক হয়ে যায়। এ কি আর তোমার আমার মত ভিকিরি বামুনের কম্ম হে ?

বিদ্যাবাগীশ। সতীদাহ প্রথা কি উঠত, যদি না রাজা রামমোহন রায় ওতে মাথা গলাতেন ?

বিদ্যাসাগর। সেইজন্যেই তো ওঁর দ্বারস্থ হয়েছি।

রাধাকান্ত। বেশ, কি করতে হবে বল ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ দিন, আপনি সে বিবাহে প্রকাশ্যে যোগদান করুন, সমাজে সেটা স্বীকৃত হোক।

রাধাকান্ত। পাত্র পাত্রী কোথায় পাব ?

বিদ্যাসাগর। আমি যোগাড় ক'রে দেব।

রাধাকান্ত। তা না হয় দিলে, বিয়েও না হয় হ'ল, কিন্তু তাদের ছেলে-পিলে যদি আইনের চক্ষে জারজ ব'লে গণ্য হয়, তখন ?

ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাবাগীশের চাক্ষুষ একটা আলাপ হইয়া গেল। ভাবটা—এইবার নূতন একটা প্যাঁচ কষিয়াছেন রাধাকান্ত

বিদ্যাসাগর। যদি দরকার হয়, আইন বদলাবারও চেষ্টা করতে হবে। গভর্মেণ্টের কাছে আপনার যথেষ্ট মান-সম্ভ্রম, আপনি চেষ্টা করলে তাও অসম্ভব না হতে পারে।

রাধাকান্ত। [হাসিয়া] অত সোজা নয়। দেখ, তোমার যুক্তিগুলি খুবই ভাল, ব্যক্তিগতভাবে আমি তার সমর্থনও করি, কিন্তু প্রকাশ্যে আমি তার সহায়তা করতে পারি না যতক্ষণ এঁরা না মত দিচ্ছেন।

পণ্ডিতদের দেখাইলেন

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কি ?

রাধাকান্ত। কারণ এঁরাই সমাজ, এঁদের সম্মতি না থাকলে, এঁদের ভাল করবারও কারও অধিকার নেই। সমাজ একটা এজমালি জিনিস—

বিদ্যাসাগর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

বিদ্যাসাগর। উঠি আমি তা হ'লে।

উঠিলেন

ন্যায়রত্ন। একটি কথার বাপু জবাব দেবে?

বিদ্যাসাগর। কি বলুন?

ন্যায়রত্ন। শুনেছি, বীরসিংহায় তোমাদের পাড়ায় একটি বাল-বিধবা সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে। সেই কি তোমার সমাজ-সংস্কারে প্রেরণা নাকি?

বিদ্যাসাগর রাধাকান্তের দিকে একবার চাহিলেন

বিদ্যাসাগর। শুধু সে নয়, আরও অনেকে।

ন্যায়রত্ন। ভাল ভাল। দেখ, চেষ্টা ক'রে দেখ, যদি তাদের দুঃখ মোচ করতে পার, এ চেষ্টা সাধু।

তর্করত্ন। তোমরা রাজি না হ'লে কি ক'রে হয় বল? [রাধাকান্তে দেখাইয়া] উনি যে সমস্ত দায়িত্বটা তোমাদের ঘাড়েই চাপি দিলেন। লোক বটে!

তর্কালঙ্কার। কিন্তু বিশ্বাস কর তুমি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়ে সত্যই আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারতে, তা হ'লে নিশ্চয়ই বিষয়ে চেষ্টিত হতাম আমরা, বিশ্বাস কর।

বিদ্যাসাগর। আরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যদি পাই, আপনাদের জানাব। কিন্তু জেনে রাখুন, বিধবা-বিবাহ হবে।

বাহির হইয়া গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিৎপুর অঞ্চল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলষষ্ঠীর রাত্রি, সুতরাং এ অঞ্চল বেশ একটু সরগরম বোধ হইতেছে। সারি সারি বেল-লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছে। 'বেলফুল' 'বরফ' 'মালাই' 'তপসে মাছ'—ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র ডাক আশ-পাশের গলির ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে গাজনের ঢাকের শব্দ—দূরত্ব-নিবন্ধন গুরুগম্ভীর ও সুমিষ্ট। সম্মুখেই একটি ঘরে খ্যামটা-নাচ চলিতেছে। ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। কালো কপাটের উপর খড়ি দেওয়া নম্বর লেখা আছে ৩১। নর্ত্তকীকে দেখা যাইতেছে না, কিন্তু নূপুরনিক্কণ ও স-তবলা-সারঙ্গ সঙ্গীত আলোকিত বাতায়নপথে ভাসিয়া আসিতেছে। লুব্ধ উন্মুখ জনতা পথের উপর দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতেছেও। জনতার অধিকাংশ লোকই তৎকালপ্রচলিত বেশে সজ্জিত। সকলেরই পায়ে ইংরেজী জুতা, কাহারও কাহারও পায়ে বুটজুতাও, মোজাও নানা রঙের। অনেকের গায়ে শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি, পরনে চওড়াপাড় সিমলের ধুতি, কাছা পাকানো। পাকানো চাদরও কাহারও কাহারও গলায় রহিয়াছে। প্রায় সকলেরই মাথায় বাহারে টেরি। সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি-মানসে কেহ কেহ দাঁতে মিশি দিয়াছে, কেহ চবরচবর করিয়া পান চিবাইতেছে, কেহ বার্ডসাই ফুঁকিতেছে। কোটপ্যাণ্ট-পরা ও মাথায় শামলা, গায়ে পিরান এ রকম লোকও আছে। অল্প একটু দূরে গৃহসংলগ্ন ফালি বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া একটি বারবনিতা এই জনতাকে লক্ষ্য করিতেছে। জনতা কিন্তু তাহার সম্বন্ধে তেমন সচেতন বলিয়া মনে হইতেছে না। মেয়েটি অতিশয় কুৎসিত। সাজসজ্জার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে তাহার কদর্য্যতা আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে

খানিকক্ষণ চলিয়া নাচগান থামিয়া গেল। ভিতর হইতে 'কেয়াবাৎ' প্রভৃতি হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। গান থামিতে অনেক লোক চলিয়া গেল। কাবলা, ন্যাপলা, মতি, নরু ও গুরুচরণ গেল না। নরু উৎকর্ণ হইয়া ঢাকের বাজনা শুনিতেছিল। গুরুচরণ ঘাড়টা যথাসম্ভব বাড়াইয়া আলোকিত বাতায়নপথে ঘরের ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গুরুচরণের ফিরিঙ্গী বেশ। গলার কলারটা বেশ শক্ত ও উঁচু-গোছের, ঘাড়টা স্বচ্ছন্দে নড়িতে পাইতেছে না। সে যে মাসখানেক কোন ইংরেজী স্কুলে পড়িয়াছিল এবং এখনও অভিধান মুখস্থ করে, তাহার প্রমাণ সে সর্ব্বদাই দিতে ব্যগ্র

নরু। [চিন্তিত] মিত্তিরদের বাড়িতে শিবের মাথার ফুল ঠিক এখনও পড়ে নি। ঢাকের বাজনাটা শোন।

মতি। তা তো শুনছি।

নরু। জগোটা তো ভারী আটকে পড়ল হে! এঃ, দমালে দেখছি।

ন্যাপলা। [ক্যাবলাকে] তোমার খুড়োই বা কখন আসবে, তা তো বুঝতে পারছি না।

ক্যাবলা। খুড়ো এল ব'লে।

মতি। খুড়োকে কি কি আনতে দিয়েছিস ?

ক্যাবলা। আতুরী, জবাবী, দু রকমই—ভাল ক'রেই জমাতে হবে আজ।

ব্যর্থমনোরথ গুরুচরণ আসিয়া কথোপকথনে যোগ দিল

গুরু। ইন্‌সাইড একদম—[বাকিটা অঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া প্রকাশ করিল]। নেক ব্যথা ক'রে ফেললাম বাবা, কিন্তু তিলমাত্র ফিলজফি পাবার জোটি নেই।

মতি। সে আবার কি, ফিলজফি কি !

গুরু। ফিলজফি মানে দর্শন। ইংরিজীটা শেখ একটু আধটু।

নরু। না, জগোর গতিক খারাপ দেখছি।

ন্যাপলা। জগো কি মিত্তির-বাড়িতে নাকি ?

নরু। হ্যাঁ, জগো ওদের শিবের বামুন যে, ফুল না পড়লে আসে কি ক'রে বল ?

ক্যাবলা। শিবের মাথায় ফুল পড়বে কি ক'রে বাবা, যা সব হিরণ্যকশিপু জন্মাচ্ছে দেশে !

মতি। যা বলেছ, রামমোহন রায় যেতে না যেতেই বিদ্যাসাগর এসে জুটেছে, সে নাকি বিধবাদের বে দেবে, দুখানা কেতাব ছেড়েছে বাজারে।

গুরুচরণ পুনরায় জানালার ধারে উঁকি দিতেছিল

ন্যাপলা। যা বলেছিস মাইরি। কালে কালে দেখবি, শিবের মাথায় ধোপায় কাপড় আছড়াবে।

গুরু। এখানকার গুড়ে তো স্যাণ্ড দেখছি, আজ নাইটে ও কপাটের নো ওপ্‌নিং, বেশ শাঁসালো ডাভ এণ্টার করেছে মনে হচ্ছে।

ন্যাপলা। খুড়োর তো টিকি দেখা যাচ্ছে না হে !

মতি। খুড়োকে পাঠিয়ে ভুল করেছ তুমি। খুড়ো আজকাল আর আমাদের তোয়াক্কা করে না। নবীন শীলের বাড়ি খুড়োর এখন দহরম-মহরম।

গুরু। ও ইয়েস, আংকল আর নবীন শীল আজকাল সোল টু সোল।

ক্যাবলা। খুড়োকে না পাঠিয়ে উপায় কি, খুড়ো না হ'লে এত রাত্তিরে কে আর মদ আনবে বল ? আর কারু সাধ্যি নেই।

ন্যাপলা। বাজে কথা। আজ মদের দোকান থেকে একটি খদ্দের ফিরছে না।

নরু। [সবিশেষ চিন্তিত] শিবের মাথার ফুলটা পড়ল না হে এখনও, মহা মুশকিল হ'ল দেখছি, মূল সন্ন্যাসী বোধ হয় কিছু খেয়েছে, ওদের দোষেই এই সব হয় কিনা !

ক্যাবলা। খুড়োরই বা হ'ল কি ? [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] নবীন শীল ! হুঁ, আমার তো অবিদিত কিছু নেই, নবনে ছিল শিপ-সরকার, আজ না হয় হয়েছে মুচ্ছুদ্দি। [সক্ষোভে] দেখতে দেখতে লাল হয়ে গেল হে, অথচ আমরা যে কে সেই র'য়ে গেলাম।

গুরু। সবই ফরহেড।

কপালে হাতে দিলেন

ক্যাবলা। আমাদের যতেও শুনছি শেরুণ্ডের বাড়ি ঢুকে এখন বেশ দু পয়সা পিটছে। ঢুকেছিল মেট-মিস্তিরি হয়ে, এখন মেয়েমানুষ রেখেছে একটি, রূপোর বকলস দেওয়া জুতো পায়ে দেয়—

হঠাৎ গাজনের ঢাকের তাল বদলাইয়া গেল। নরু উল্লসিত হইয়া উঠিল

নরু। ফুল পড়েছে, ফুল পড়েছে। আমি যাই, চট ক'রে ডেকে নিয়ে আসি তাকে, আবার না কোন ঝামেলায় আটকে পড়ে।

চলিয়া গেল

মতি। ও বাঁচল।

দূরে একটা কোলাহল ও সঙ্গীত শোনা গেল

ন্যাপলা। স'রে দাঁড়াও, স'রে দাঁড়াও—সং আসছে।

হাসির হররা ও হুল্লোড় করিতে করিতে খোল করতাল প্রভৃতি বাজাইয়া সংকীর্তনের দলের মত একটা দল প্রবেশ করিল। বিধবাবেশী কয়েকজন পুরুষ উদ্বাহ হইয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে

গান

বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই,
আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে।

গান গাহিতে গাহিতে দলটি চলিয়া গেল

ক্যাবলা। সত্যি? সদরে রিপোর্ট করেছে নাকি হে বিদ্যাসাগর?

মতি। করে নি এখনও, কিন্তু তার উজ্জুগ চলছে। বাজারে রটি ছেড়েছে দুখানা। রিপোর্টও করবে ঠিক, ভয়ঙ্কর লোক, য করতে পারে।

ন্যাপলা। তুই চিনিস নাকি?

মতি। চিনি না! সেবার পেনেটির পিক্‌নিকের খরচটা তো ওর কাছ থেকেই বাগিয়েছিলাম। লোকটার পণ্ডিত পণ্ডিত ব'লে এত নামডাক, আসলে কিন্তু একটি হাঁদারাম। মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে একবার ধরলেই হ'ল গিয়ে।

ক্যাবলা। কি বলেছিলি তুই?

মতি। [অভিনয় করিয়া] "আমার বাবা বিনা চিকিচ্ছেয় মারা গেছে, আমার বোনটি শুষছে, আমাদের ঘরদোর সব দামোদরের বানে ডুবে গেছে, তিন দিন খেতে পাই নি—" তারপর দু ফোঁটা চোখের জল, বাস্, তারপর পাঁচটি টাকা।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

ন্যাপলা। কি রকম দেখতে রে লোকটা?

মতি। কাঠগোঁয়ারের মত চেহারা। ঘোর নাস্তিক শুনেছি। তার ওপর ভয়ঙ্কর জিদী, ঠিক ও বিধবার বিয়ে দেবে। এক রাধাকান্ত দেব যদি ওকে আটকাতে পারে, আর কেউ পারবে না।

ক্যাবলা। না রে, দেশে এখনও মহাপুরুষ আছে।

মতি। তাই নাকি?

ক্যাবলা। নিশ্চয়। আমার ছোট পিসীর দেওর সেদিন রিষড়ে গেসল, স্বচক্ষে দেখে এসেছে—স্বচক্ষে। হিমালয়ের এক সন্ন্যেসী পারাভস্ম খাইয়ে তিন দিনের বাসী মড়াকে বাঁচিয়ে দিলে। ভস্ম মুখে ঠেকাবা-মাত্র মড়া তড়াক ক'রে উঠে বসল। লোহাকে সোনা করতে পারে।

মতি। দ্বিতীয় হোসেন খাঁ বল!

ন্যাপলা। সে আবার কে?

মতি। তুই এখুনি ভূমিষ্ঠ হলি নাকি? হোসেন খাঁর নাম শুনিস

নি? মন্তরের জোরে উইল্‌সনের হোটেল থেকে পাঁউরুটি প
করত সে।

ন্যাপলা। কবে বল তো?

মতি। এই তো কিছুদিন আগে।

ন্যাপলা। ও, আমি তা হ'লে তখন ছিলুম না বোধ হয়, পিসীর সঙ্গে
বৃন্দাবন গেসলাম।

কথা কহিতে কহিতে নরু ও কালীর প্রবেশ

কালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মিত্তির-বাড়ি থেকেই আসছি। শিবের মাথা
ফুল কিছুতে পড়ছিল না তা ঠিক, শেষটা বাবুকে বাঁধতে হ'ল। বা
পায়নাপেলের চাপকান প'রে এই দিকেই আসছিলেন, কিন্তু হুকু
হ'ল তাঁকে, উপায় কি?

নরু। কিন্তু জগো কোথায়? তাকেই তো খুঁজছি আমি, সে যে ওদে
বাড়ি শিবের বামুন হয়েছিল।

কালী। [সবিস্ময়ে] কে বললে? গঙ্গাজল ছিটুচ্ছিল তো নে
শিরোমণি, জগো ও তল্লাটে ছিল না।

নরু। কি আশ্চর্য্য! জগো তা হ'লে গেল কোথা? আমার কাছ থে
দুটো টাকা নিয়ে এল, ব'লে এল, পুজোটি সেরেই আমি আসছি
৬১ নম্বর বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতে বললে, তার ভরসায় এ
আটকে রেখেছি—

৬১ নম্বর ঘরের ভিতর আবার তবলা ও সারঙ্গ বাঁধার আওয়াজ শোনা যাইতে
লাগিল

গুরু। [সক্ষোভে] এদের আবার কমেন্সমেণ্ট হ'ল। আর আ
স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে ভ্যারেণ্ডা ফ্রাই করছি কেবল। [ক্যাবলার দি
চাহিয়া] তোমার খুড়োই আমাদের ড্রাউন করালে আজ।

ন্যাপলা। খুড়ো টাকা কটি মেরে সরেছে।

ক্যাবলা। [জিব কাটিয়া] না না, খুড়োর সম্বন্ধে ও কথা বলা যায় না।

কথা শেষ হইতে না হইতে খুড়ো ও জগো প্রবেশ করিল। উভয়েরই বগলে বোতল, উভয়েরই পা টলিতেছে

এটা কি রকম হ'ল খুড়ো?

খুড়ো। কুস পরোয়া নেই বাওয়া, সব লাল হো যায়গা, লা—লে লাল।

জগো। [নরুর মুখের সামনে হাত নাড়িয়া, সুরে] কিনে দেব মাথাঘষা,
বারুইপুরে ঘুনসি খাসা, উভয়ের পুরাবি আশা, ও যাদুমণি—

ইহাতে নরু অত্যন্ত চটিয়া গেল

নরু। আশা পোরাচ্ছি, থাম তোর শালা—

জগোর গলার চাদর মুঠি করিয়া ধরিল

দে, টাকা দে আমার।

গুরু। আহা নরু, রেজ কন্‌ট্রোল কর ব্রাদার, ফাইট ক'র না,
পুলিসের হুজ্জুতে পড়লে নিউ ডিফিকাল্‌টি হবে আবার একটা।
আর ডিলে না ক'রে রিসার্চ করিগে চল, ডোর টু ডোর ঘুরলে
এখনও—কি বল মতি?

মতি। হ্যাঁ, তাই চল।

সকলে চলিয়া গেলে ৬১ নম্বরের দরজা খুলিয়া দুইজন ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। চাদর সামলাইতে গিয়া একজনের পকেট হইতে একটি পুস্তিকা মাটিতে পড়িয়া গেল

প্রথম ভদ্রলোক। ওখানা কি হে?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওখানা বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক দ্বিতীয়
প্রস্তাব।

প্রথম ভদ্রলোক। লোকটার কি পাগলামি দেখ তো!

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। পাগলামি কোথায় দেখলে তুমি? তোমার
গাড়ি কই?

প্রথম ভদ্রলোক। আসছে এখনই।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। বিদ্যাসাগর প্রস্তাব লিখেই ক্ষান্ত হন নি শুধু, ব্যবস্থাপক সভায় যাতে আইন পাস হয়, তার জন্যে চেষ্টা করছেন।

প্রথম ভদ্রলোক। কি রকম?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। একটা দরখাস্ত লিখে তাতে বহু লোকের সই সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছেন। বিকেলে আজ আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, সেই সময়ে এই বইখানাও দিলেন আমাকে। আমাদের বাড়ি থেকে হেঁটেই বেলুড় চ'লে গেলেন।

প্রথম ভদ্রলোক। ক্ষেপে উঠেছে বল।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওঁকে আরও ক্ষেপিয়েছেন রাধাকান্ত দেব। উনি যদি এর বিরুদ্ধে না যেতেন, তা হ'লে হয়তো বিদ্যাসাগর মশায় এতটা উঠে প'ড়ে লাগতেন না।

প্রথম ভদ্রলোক। রাধাকান্ত দেবই বা কি করবেন বল, নানা পণ্ডিত যে নানা কথা কইছেন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। কেউ কথা কইছেন না, সবাই ছাতারে পাখির মত কচর-কচর করছেন। এমন একজন পণ্ডিত নেই, যার কথার জবাব বিদ্যাসাগর মশায় দেন নি। দ্বিতীয় প্রস্তাবটা প'ড়ে দেখো—তুলো ধোনা ক'রে ছেড়েছেন।

প্রথম ভদ্রলোক। সকলকার আপত্তি খণ্ডন করেছেন?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। চুল চিরে।

প্রথম ভদ্রলোক। কিন্তু শুনেছি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন—

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। নাম ক'র না ওঁদের, ওঁরা সব ভণ্ড। ওঁরাই কিছুদিন আগে নাম সই ক'রে শ্যামাচরণ দাসের বিধবা মেয়ের বিয়ের ফতোয়া দিয়েছিলেন, কিন্তু যেই ম্যাও ধরবার সময় এল, অমনই সব পিছিয়ে গেলেন। বল কেন ওঁদের কথা! একটা কথা জেনে রেখো—ওই সব বিদ্যারত্ন, তর্কসিদ্ধান্ত, বিদ্যাবাগীশ, চূড়ামণির বিদ্যের জাহাজ হতে পারেন, কিন্তু সাগরকে অতিক্রম করতে

পারেন নি কেউ। কই, তোমার গাড়ি কত দূর হে? হেঁটেই চল না হয়।

ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন

একি, নাম করতে করতেই যে—কি বিপদ, চল, ঘরের ভেতরে ঢোকা যাক।

প্রথম ভদ্রলোক। কেন?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। দেখছ না, বিদ্যাসাগর মশায় আসছেন যে। এদিকে হঠাৎ কেন বাবা? বেলুড় থেকে ফিরছেন বোধ হয়।

উভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। বারান্দার বারাঙ্গনাটি তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হনহন করিয়া বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বারবনিতাকে ছাড়াইয়া হনহন করিয়া কিছুদূর চলিয়া গেলেন। তাহার পর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বারবনিতার সম্মুখীন হইলেন

বিদ্যাসাগর। তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ?

বারবনিতা। কি আর করব, ব্যবসা—

বিদ্যাসাগর। [ইতস্তত করিয়া] তুমি—

বারবনিতা। অত ঢঙে কাজ কি বাপু, আসবে তো এস না!

বিদ্যাসাগরের সমস্ত মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সহসা তিনি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেলেন

বিদ্যাসাগর। নাও।

বারবনিতা। কেন?

বিদ্যাসাগর। দিচ্ছি, এমনি দিচ্ছি, নাও।

একটু ইতস্ততের পর মেয়েটি টাকা লইল

বিদ্যাসাগর। যাও, এইবার ঘরে যাও, অনেক রাত হয়েছে। আর—

বারবনিতা। [সবিস্ময়ে] আবার কি?

বিদ্যাসাগর। আর ক্ষমা ক'র আমাদের।

দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন

ক্রমশ

"বনফুল"

মহাকাব্যের খসড়া

(বিংশ শতাব্দীর)

আধা-নিষ্প্রদীপে কলিকাতার পথ অন্ধকার, দোকানের আলো ফুট-পাথে পড়িবার উপায় নাই, মানুষ গাড়ি দেখিতে পায় না, গাড়ি মানুষ দেখিতে পায় না, সাবধানে রাস্তা পার হইতে হয়। ইহার উপরে চৌমাথার মাঝখানে পাগলের উপদ্রব—বায়স্কোপের ভিড় তাহার মধ্যে অজস্র যানবাহনের সম্মুখে রণনৃত্য। পুলিস রুখিতে পারে না। মোটরের মধ্যে রূপসী মেয়ে দেখিলে বলে, একটা কাঁচি সিগ্রেট। চিঠি থাকে তো দাও, ডাকে দোব।

* * *

ক্যাল্‌কাটা মেল কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। রাত্রির অন্ধকার চিরিয়া সশব্দে নামিয়া আসে, ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া তার আসা ও যাওয়া মহাকালের পদক্ষেপের সঙ্গে। ভোরবেলা অলক পাটনায় নামে।

কালসমুদ্রে কয়েকটি বুদ্বুদ ফোটে ও ফাটে।
নামিয়া আসে এক বৈশাখী সন্ধ্যা।

* * *

একখানি বাসন্তী রঙের লম্বা খাম অলকের টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল, অনেক রাত্রে নিমন্ত্রণ সারিয়া ফিরিয়া সে আসিয়া দেখিল কোণে লাল হরফে 'শুভবিবাহ' লেখা। এই নিদারুণ গরমে লগনসা বাজারে আবার কোথায় দুর্ভোগ আছে জানিবার জন্য ভিতরের কাগজখানি বাহির করিয়া লইল।

ও, যূথিকার বিবাহ!

ঠাকুরকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, প্রকাণ্ড মোটরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক

আসিয়া তাহাকে খুঁজিয়াছিলেন, না পাইয়া পত্র দিয়া বিশেষ করিয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছেন।

অলক ভ্রূকুঞ্চিত করিল। বিশেষ করিয়াই তো বলিবার কথা, শীতলবাবু কি করিয়াই বা জানিবেন সে সব কথা!

আপনার ঘরে গিয়া ছাদের দিকের জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া আলো নিবাইয়া সে শয্যা আশ্রয় করে। ঘরের ঘন অন্ধকার রাস্তার গ্যাসের আলোয় খানিকটা পাতলা হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণে হাওয়া মাঝে মাঝে ঝোড়ো-মাতন লইয়া প্রত্যেকটি আসবাবপত্র দোলাইয়া যায়।

* * *

দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে সে পাটনায় নামে। হেড-অফিস সংক্রান্ত কাজ ছিল শীতলবাবুর সঙ্গে, সাহেবের বার্তা লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করে। সেই সূত্রে পাটনায় তাহাকে দিন সাতেক অতিবাহিত করিতে হয়।

যূথিকার বয়স বোধ হয় তখন তেরোর বেশি নয়, ফ্রক পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অলক ডাক দেয়, খুকী, তুমি কি পড়?

কালিদাসের কালে হয়তো তেরো বছরের মেয়ের রূপবর্ণনা চলিত, বটতলার ঔপন্যাসিকরাও বিচিত্র তুলির টানে তাহাকে রমণীয় করিয়া নায়কের নাসারন্ধ্র কম্পিত করিয়া ছাড়িতেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর তেরোর সে গেরো নাই, একফোঁটা মেয়ে বলিয়া তাহাকে অবহেলা করিলে তাহার বাপ মা খুশিই হইবেন, পাঠকদেরও অভ্যস্ত চোখে ত্রয়োদশীরা নগণ্য।

কিন্তু এই মেয়েটিকে অত সহজে ছাড়িয়া দেওয়া চলে না, মাথায় যেমন সে ষোল বছরের সমান হইয়া উঠিয়াছে, ফ্রকও তেমনই শেমিজ বলিয়া ভুল করিবার কথা। সে যখন কথা কহিল, তখন পরিপক্কতা সম্বন্ধে আর সংশয় রহিল না।

অলকের ঈজি-চেয়ারের হাতলের উপরে বসিয়া সকালবেলায় 'কোটি সেণ্টের গন্ধ ছড়াইয়া দীর্ঘ বেণীটিকে বাঁ দিকের কাঁধে টানিয়া আনি সে বলিল, আমি পড়ি কি? পড়ি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র।

রীতিমত ঘাবড়াইয়া গিয়া অলক বলিল, বুঝতে পার?

তাহার জবাব হইল, আপনাকে বোঝাতে পারি। অত বড় ভাববেন না আমাকে, আর নিজেকে অত মুরুব্বিও মনে করবেন না বুঝলেন?

হাঁ, খুব বুঝিয়াছে, অলক ঘামিতে লাগিল। কথাটার মোড় ঘুরাইবার জন্য অলক বলিল, তুমি গান জান?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে যূথিকা বলে, জানি মানে? এখনকার কোন্ মেয়ে না জানে? আপনার বলা উচিত ছিল—গান কর। আসুন আমার সঙ্গে —বলিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সামনের ড্রয়িং রুমে গিয়া ঢুকিল। সোফা দেখাইয়া বলিল, বসুন।

কোণের অর্গ্যানটা খুলিয়া ধরিল—

অলকে কুসুম না দিয়ো।
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।

'অলকে' কথাটায় বেশি জোর পড়িতে লাগিল। অলকের জানা নাই, কবির নিজের দেওয়া সুর তাই কি না।

কণ্ঠ মার্জ্জিত ও সুরেলা, অলকের ভাব জাগে।

অলককে বলিতেই হয়, কি চমৎকার তোমার গলা! আর একটা গাও।

ঐ তো আপনাদের দোষ!—কলকণ্ঠে কিশোরী বলিয়া ওঠে, একটা পেলেই আর একটা চাইবেন। বসতে পেলেই শুতে চান। পুরুষ মানুষের দশাই ঐ।

যূথী!—পর্দ্দার আড়াল হইতে ডাক আসে।

যাই মা।—বলিয়া যূথিকা উঠিয়া যায়, চলিতে চলিতে বলে, সন্ধ্যাবেলা শোনাব গান। কেমন? এখন কাগজ পড়ুন, কিম্বা রেডিও শুনুন ব'সে ব'সে।

দিল্লী হইতে গান আসিতেছিল, মীরাকে প্রভু গিরধারী গোপাল—

ঐ এক লাইন অন্তত সাতাশ বার সাতাশ রকম সুরে। বিরক্তি ধরিয়া যায় অলকের। যূথী ফিরিতে বলে, ক্যাল্‌কাটা স্টেশন ধর তো।

কলকাতা থেকে বলছি, কবিরাজ ঘনশ্যাম তর্করত্নের গান আপনারা শুনলেন, এবার শ্রীযুত ছাবা এবং শ্রীমতী দেবীর একটি দ্বৈত সঙ্গীত শুনুন, গানটির প্রথম লাইন হচ্ছে—যেমন তুমি তেমনই আমি, যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

বন্ধ কর, বন্ধ কর, জ্বালালে! অন্য স্টেশন দাও।—অলক বিরক্তিতে চীৎকার করিয়া উঠে।

শুনুন লক্ষ্ণৌ, গর্জ্জনবাঈয়ের ঠুংরি চলছে।

পাড়ার কতিপয় ছেলেমেয়ে যূথীর খোঁজে আসে, যূথী ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। খানিক পরেই দেখা গেল, কি একটা খেলা গভীর মনযোগের সহিত সকলে খেলিতেছে অশোকগাছের নীচে, যূথী তাহাদের নেত্রী। যূথীর সর্দ্দারি অপ্রতিহত গতিতে চলে, এগারো-বারো বছরের ছেলেগুলি যূথীদির নির্দ্দেশে কান ধরিয়া দাঁড়ায়।

যাকে খুশি সে চড় মারে, যাকে ইচ্ছা সে আদর করে, উরু হইতে অনাবৃত গৌরবর্ণ দুইখানি পায়ের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া কৃপালোভী ছেলেগুলার ক্যাংলামির আর অন্ত নাই। কুমির কুমির খেলিবার সময় তাহাকে ছুঁইয়া দিয়া কুমির করিবার প্রবৃত্তি প্রত্যেক বালক যেন পাইয়া

বসে। যূথী বলে, এই পেঁচো, আমার দিকে কি দেখছিস, যা না ঐ দিকে। উজ্জ্বলা তো তোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, হাত বাড়ালেই পাস। আমার ওপর নজর কেন?

দুপুরের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, বিহারের মাটি আসন্ন লু-এর ভয়ে যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে, আগুনের হলকায় অলক বাহির হইয়া আসিল বারান্দায়। বাগানে কোথায় যূথীর গলা পাওয়া যাইতেছে।

অলকবাবু, টু-উ-উ!

অলক চমকাইয়া উঠিল, এধার ওধার দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ আবার, 'অলকবাবু, টু-উ-উ' শুনিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি মেলিয়া দেখে, তেঁতুলগাছের উচ্চ শাখায় যূথী দাঁড়াইয়া আছে তাহার একটা ডাল ধরিয়া।

কি করছ এই রোদে? অসুখ করবে যে।—অলক ভর্ৎসনা করে।

আমার এ রোদ সওয়া। এদেশে মানুষ আমি, ভুলছেন কেন? এ কি আপনি যে, ননীর পুতুল, গ'লে যাব?—বলিতে বলিতে সে আরও নীচে নামিয়া আসে। হাসিয়া বলে, দাঁড়ান তো ওখানে, আপনার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বিসদৃশ ব্যাপারটার অসম্ভাব্যতা কল্পনা করিয়া ত্রস্তপদে অলক সরিয়া যায়।

ভেতো বাঙালী। অমনই পালাচ্ছেন। রামভরোস কি ক'রে পারে? ডালরুটি খায় ব'লে?

কে রামভরোস—অলকের জানা নাই, অলক আর তাতে দাঁড়াইতে পারে না, ঘরের দিকে পা চালাইয়া দেয়।

যূথীর মা যূথীর খোঁজ করে, সরু কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বলে, রামভরোস যূথীবাবাকো পাকড়কে লে আও, কাঁহা ধুপমে ঠহলতি।

যূথীবাবাকে বলপ্রয়োগে বন্দিনী করিয়া রামভরোস মাতার কাছে পৌঁছাইয়া দেয়, তাহার সগর্জ্জন সজোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও।

সেদিন বিকালে যূথী রামধনু-রঙের শাড়ি পরিয়া আসে, জরিবাঁধা বেণী নাই, আলগা এলো খোঁপা, কপালে ঝকমকে সোনালী টিপ, মুখকে আর চেনা যায় না। যূথী ধীরে চলে, স্থির হইয়া চেয়ারে বসে, ক্লান্ত দৃষ্টি দূরে পাঠাইয়া দেয় বাগানের প্রাচীর পার করিয়া পিচ-ঢালা রাস্তার দিকে, যেখানে ঝুনঝুন করিয়া এক্কা চলিয়াছে মোটরবাসের ধুলার মধ্য দিয়া।

কোকো খাইতে খাইতে যূথী বলে, কেমন দেখাচ্ছে বলুন তো?

খুব ভারিক্কী।

ভারী চালে কথাটা বললেন। জানেন, আমরা সব বাইরে শুই গরমের দিনে। আপনার বিছানা এখানে হবে, যেখানে ব'সে আছেন।

আর তোমার?

আমার এইখানে, যেখানে ব'সে আছি। তারপর বাবা। মা শোন ঘরে। তাঁর ভয় করে।

শীতলবাবু আসিয়া পড়িলেন, যূথী উঠিয়া গেল। তাহার দিকে সযত্নে চাহিয়া তাহার বাবা বলিলেন, আরে, আমাদের যূথীকে আজ চেনবার জো নেই, ঠিক আমার মা-জননী।

যাও-ও।—বলিয়া যূথী ঘন পর্দ্দার ওধারে মিলাইয়া যায়।

অফিসের কাজ। রুক্ষ ও কঠিন। অনেক চিন্তা ও অনেক ঘর্ম্ম। কল্পনার লেশ নাই। তারপর স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক আলাপ করিতে আসেন। বিরস বদনের নীরস আলোচনা।

পরিণাম-রমণীয় গ্রীষ্ম-দিবসের শুক্লরজনী ক্ষয় হইতে থাকে। খাবার

ডাক পড়ে। সেখানে বেশি কথা হয় না। শীতলবাবু আহারে
নিজের ঘরে গিয়া ঢোকেন বইয়ের পাতার সঙ্গে হুইস্কির ছিপি খুলিয়া

যূথীকে অলক অনুরোধ করে, শুধু গলায় একটা গান ধরিতে
বারান্দার আলোছায়া-মিশ্রিত ফুলগন্ধ-উতল অবসাদের মধ্যে সে ধরে—

আমি যবে রব না পাশে
প্রিয় তখনো উঠিবে চাঁদ
নীল-আকাশে।
তখনো কাননে পাখি
যাবে যাবে যাবে ডাকি
নিজেরে ভাবি একাকী
কাঁদিবে মাধবী-মাসে।

এই বাচ্চা মেয়েকে এই গান কে শিখাইল, ভাবিয়া অলকের বি
জাগে। এ কি সব কথার অর্থ বোঝে? না বুঝিল তো সময় বুঝি
লোক বুঝিয়া গাহিল কি করিয়া? অলক একটা প্রশংসার বা
শোনাইতে পারে না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যূথী উঠিয়া যায়।

বেয়ারারা আসিয়া পাশাপাশি তিনখানা খাটিয়া পাতিয়া বিছা
করিয়া মশারি টাঙাইয়া দিয়া যায়। অলক গিয়া লনে পায়চারি
পৃথিবীর সমস্ত কথা নিঃশেষে বুঝিবার শক্তি কেন মানুষ সঞ্চয় করে
ভাবিয়া সে অন্যমনস্ক হইয়া যায়।

ঝাউগাছগুলার পাতায় সরসর আওয়াজ হয়, চোখে তন্দ্রা জড়া
আসে, সে শুইতে যায়।

সাদা মশারির মধ্যে অস্পষ্ট দেখা যায়, যূথী শুইয়া পড়িয়াছে। শী
বাবু তখনও আসেন নাই।

নিজের বিছানায় ঢুকিয়া দেখে—বালিশের পাশে রাশি রাশি ফু

ফুল। এক মুঠো ফুল অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া তাহার মদির সুরভি সে সমস্ত অন্তর দিয়া যেন গ্রহণ করে। এ কি যূথী নিজে রাখিয়া গিয়াছে?

জড়িতকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে শীতলবাবু আসিয়া শোন। অলক মনে করিয়াছিল, আজ রাত্রে তাহার সহজে ঘুম আসিবে না, এবং সে খুব ভোরে উঠিয়া যূথীকে দেখিবে। দুইটা মনে করাই তাহার বৃথা হইল। গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন হইল, এবং যখন যূথীর কলকণ্ঠে জাগিল, তখন বিছানার উপর রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, দুইটি বিছানা সরাইয়া লইয়া চাকররা চেয়ার পাতিতেছে। খবরের কাগজ অবধি আসিয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন মোটরে করিয়া এখানে ওখানে যাওয়া হইল। ইচ্ছা থাকিলেও অলক যূথীর পাশে বসিতে পায় নাই, ভিতরে তাহার মা বসার দরুন তাহাকে বাহিরেই আশ্রয় লইতে হয়।

বিদায়ের আগের দিন রাত্রে এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

শুভ্র শুক্লরাত্রি অকস্মাৎ কৃষ্ণরজনীর মত অন্ধকার হইয়া গেল, তীব্র তীক্ষ্ণ ধূলির ঝটিকা ধরণী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সোঁ সোঁ সোঁ শব্দ করিতে করিতে বাগানের সমস্ত গাছকে আক্রমণ করিল, বারান্দার টবের গাছগুলিকে হেলাইয়া দুলাইয়া জানালা দরজা কাঁপাইয়া মশারিগুলাকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া জুঁইফুলগুলাকে চারিধারে ছড়াইয়া তাহার মাতামাতি সুরু হইল।

কি ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া অলক বিছানায় উঠিয়া বসিল, দেখে যূথীও জাগিয়া উঠিয়াছে। কাছে আসিয়া কাঁধে হাত দিয়া ঠেসিয়া বসিল, ভয় করছে আপনার? এ আঁধি। এখুনি কেটে যাবে।

এই আঁধি? আঁধারে চারিদিক ভরিয়া আসে, তাহার নাম আঁধি? চোখের মধ্যে অজস্র ধূলা বালি ঢুকিয়া গিয়াছে, পরিষ্কার করিতে

করিতে মৃদু বৃষ্টির শীতজলকণা গায়ে আসিয়া ঝাপটা দিল, ঝড় থামিতে চায় না, আঁধি যাইতে চায় না।

তোমার বাবা ঘুমোচ্ছেন ?

অচৈতন্য।

কাল সকালেই তো চ'লে যাব। বেশ লাগল তোমাদের সঙ্গ।

আমাদের ? আমার নয় ?

আচ্ছা, এখানে ফুলগুলা রোজ কে রাখে ?

আপনি ও ফুল ভালবাসেন ?

কেশের গুচ্ছকে তুমি ভালবাস ?

খুব।

আমিও ও ফুল ভালবাসি। মানেটা বুঝলে তো ? অলক যূথীকে, যূথী অলককে ভালবাসে। আর সে কথা এমন আঁধির মাঝখানেই হয়তো বলা যায়।

বুঝেছি মশাই। অত ক'রে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে না। আপনি বরঞ্চ সব কথা বুঝতে পারেন না।

আঁধি কাটিয়া গেল, রাত তখনও খানিকটা ছিল, সেও শেষ হইয়া গেল।

বিদায়ের কালে যূথী নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া গেল পায়ে হাত ঠেকাইয়া।

অলক বলিল, চিঠি লিখলে জবাব দেবে ?

দোব।

বাড়িতে আসিয়া অলকের কেবলই মনে হইতে লাগিল, এতটুকু মেয়ের মনে পাপ ঢোকানো তাহার উচিত হয় নাই। স্বর্গের ফুলের মধ্যে

বিষাক্ত কীট সে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে বলিয়া তাহার অনুশোচনার অবধি রহিল না।

তবু একখানা সাধারণ কাগজে বিশ্রী হাতের লেখায় গদ্য-ধরনের কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়া যেসব কথা সে লিখিয়া ফেলিল, তা একটা ছোট মেয়েকে না লিখিলেও চলিত।

জবাব আসিল নীল খামে গোলাপী প্যাডের কাগজে, রাঙা গোলাপের পাপড়ি সঙ্গে লইয়া—আমার জীবনে তুমি প্রথম পুরুষ। যৌবনের দীপ্ত দেউলে তুমি প্রথম অতিথি। আমাকে নিঃস্ব ক'রে দিয়ে গেছ।

এর পর পুরা এক বৎসর ধরিয়া যে পঞ্চান্নখানা চিঠির পঞ্চান্নখানা জবাব সে লাভ করিল, তাহার একখানি—

তোমায় আমায় বিয়ে হওয়া অসম্ভব। আমি বৈদ্য, তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান। হয়তো পালিয়ে গিয়ে রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ হতে পারত, কিন্তু তাতে আমার বাবার মনে দুঃখ দেওয়া হবে, যাঁর চেয়ে ভাল আমি কাউকে বাসতে পারি না। আত্মহত্যাতেও সেই কথা খাটে। এ জীবনে হয়তো মিলন হবে না, কিন্তু তোমায় আমি ভালবাসব চিরদিন, মনে রাখব প্রিয়তম। আমাকে যে বিয়ে করবে, সে আমার দেহটাই পাবে, মনটা পাবে না। তুমি আমায় জাগিয়ে তুলেছ সোনার কাঠির স্পর্শে। তোমাকে দিয়েছি আমার অসীম বিশ্বাস। কখনও তার অমর্যাদা করবে না তুমি, এ আমি জানি। তোমার জন্যেই আমি কলঙ্কিনী, তোমার জন্যেই আমি সাহসিকা। যেদিন আমার জন্যে তোমার বাৎসল্য ও তোমার জন্যে আমার ভক্তি আসবার কথা, সেদিন কোন্ অতনুর ফুলশরে জেগেছিল প্রেম। সে প্রেমের অসম্মান ক'র না কোন দিন। আমাকে ধূলিলুণ্ঠিত করবার অস্ত্র তোমার হাতে

তুলে দিয়ে এই ভরসায় আমি বিদায় নোব, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের মতন তুমি আমাকে রক্ষা করবে সকল বিপদ থেকে।

এই চিঠি পাইয়া সচেতন পৌরুষের গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল অলক। সে লিখিয়াছিল, আমি তোমায় ছুটি দিলাম। যাকে খুশি বিবাহ ক'রে তুমি সুখী হও, এই আশীর্ব্বাদ। বাস্তবিক আমাদের বিয়ে উভয়ের দিক থেকেই অসম্ভব। আমার মাকেও আমি ক্ষুণ্ণ করতে পারি না। তোমাকে কোন দিন অপ্রস্তুত করব না, এ বিশ্বাস তুমি রাখতে পার।

এমনই একখানি চিঠি যূথীর মায়ের হাতে পড়ে, সেই দিন হইতে পত্র-ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়, এবং শীতলবাবু আদাজল খাইয়া পাত্র খুঁজিতে লাগিয়া যান। মেয়েকে বেশি কিছু বলাও বিপদ, পাছে বিষ খায় বা আগুনে পুড়িয়া মরে। অলকের তিনখানি চিঠি বাহিরের লেটার-বক্স হইতে চুরি করা হয় এবং যূথীর দুইখানি চিঠি চাকরের হাত হইতে সরানো হয়। কোথায় কি হইল, তাহারা জানিতেও পারে না।

অলক যূথীকে শেষ চিঠিতে লিখিয়াছিল—দুখানা চিঠির জবাব পাই নি। এখানার না পেলে বুঝব, আমাকে তুমি ভুলে গেছ কিংবা ঘৃণা কর। এর পর তোমার মতন অবিশ্বাসিনীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। আমিও ভুলে যাব যে, কখনও আলাপ হয়েছিল বা যূথী ব'লে কোন মেয়েকে আমি চিনি।

তাহারও যখন উত্তর আসিল না, তখন ছয় মাস ধরিয়া অলক দুর্ব্বোধ্য ক্রূর নারীচিত্তের প্রতি বিজাতীয় মনোভাবই পোষণ করিয়াছে এবং এক রকম প্রতিজ্ঞাই করিয়া ফেলিয়াছে, বিবাহ করিবে না জীবনে। আধুনিক নারী আর করাত সাপ এক, এই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস।

* * *

আজ বাসন্তী রঙের খামখানি দেখিয়া তাহার অনেক কথাই মনে পড়িল। মনে হইল, এ শুধু তাহাকে আঘাত করিবার জন্য, নয়তো অফিসের খাতিরে শীতলবাবুর ভদ্রতা রক্ষা।

তবু একবার দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল, দেড় বছরে সেই অপূর্ব্ব তরুণী কেমন লোভনীয় হইয়াছে। বর্ষাবিস্ফারিত নদীর দুই-কূলপ্লাবী প্রভাত-সৌন্দর্য্যের কথা তাহার চোখে জাগিল।

দীনেন্দ্র স্ট্রীটের ঠিকানা দেখিয়া অলক কাঁধে চাদর ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়িটা প্রকাণ্ড, বিবাহের জন্য ভাড়া দিয়াই বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। সানাই বাজিতেছে, অনেক লোকের আসা যাওয়া। শীতলবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে দেরি হইল।

অলক বলিল, একবার যূথীর সঙ্গে দেখা করব।

তাহার ভঙ্গিতে এমন একটা রূঢ়তা ছিল যে, শীতলবাবু কিছু অঘটন আশঙ্কা করিলেন। অফিসের লোককে চটাইতে চান না, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আসিয়া কহিলেন, এখন গায়ে হলুদ চলছে, যূথী যে ভয়ানক ব্যস্ত। কাল বরঞ্চ সকালে একবার—

বেশ। কাল যেন নিশ্চয় দেখা পাই।

তাহার মাথায় যেন আগুন জ্বলিতেছে। অস্ত্র অনেক, কোন্‌টা সে ব্যবহার করিবে ভাবিয়া সমস্ত রাত ঘুম হইল না। মানুষের মধ্যে পশু জাগিয়া উঠিয়াছে, নারী যাহা জাগাইতে পারে।

সকালবেলাই গিয়া হাজির হইল। শীতলবাবুকে বলিল, কোথায়?

একটা ঘরে দেখা করানোর বন্দোবস্ত হইল। আলমারির আয়নায় তাহার ছায়া পড়িতেই দরজা দিয়া যূথী প্রবেশ করিল। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! অকালযৌবনে কিশোরী মদির হইয়া উঠিয়াছে, কিছু কৃশ ছিল, আজ পরিপূর্ণ। চুড়িতে, কণ্ঠহারে, সুবিন্যস্ত শাড়িতে ও কেশ-

বিন্যাসে সম্পূর্ণ নারীমূর্ত্তি, চাপল্যের লেশ নাই, গাম্ভীর্য্যে বিষণ্ণতায় সে
সুদূর। আজ আসিয়াই প্রথম কথা সে বলিল না, লজ্জায় মুখ নী
করিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। তাহাকে দেখিয়াই খানিকটা ধা
খাইয়া রুক্ষকণ্ঠে অলক আঘাত করিল, এবার যদি আমি সব প্রক
ক'রে দিই ?

সভয়ে যূথী মুখ তুলিয়া বলিল, কেন? কি করেছি আমি? আপ
কেন ও রকম বলছেন?

কি না করেছ, তাই বল? আমার জীবন তুমি নষ্ট ক'রে দিয়ে
তোমাকেও শান্তিতে ঘর বাঁধতে দোব না। বিয়ের আগে কিছু ব
না, বিয়ে হয়ে গেলে সমস্ত কথা ব'লে আসব তোমার স্বামীকে
আমার শেষ চিঠির জবাব তুমি দাও নি, তার মানে তুমি আমায় ঘৃ
কর, সে কথা আমি ভুলি নি।

বিস্মিত নয়নে যূথী বলিল, কি সব বলছেন? আপনি বা
আমার—

যূথীর মা সব বেফাঁস হইয়া যায় দেখিয়া, ডাক দিল, যূ
চ'লে এস।

ভাষাহীন অভিযোগে অভিমানে ও অপমানে অলক দিশাহারা হই
গিয়াছিল, দশ দিনের ছুটি লইয়া সে বাড়িতে বসিয়া মাথা ঠাণ্ডা করি
চেষ্টা করিল। কেন যে রাগ আসে, তাহা সে বুঝিতে পারে না, বলি
পারে না, অথচ অস্বস্তিরও শেষ নাই।

একখানি চিঠি সে খুলিয়া পড়ে—

প্রিয়া ব'লে রাণী হ'লে রাহু ব'লে ডাকো!
দু বাহুতে ঘিরে মোরে কাছে টেনে রাখো।

এই একখানিই আগুন জ্বালাইবার পক্ষে যথেষ্ট। তবু সে পঞ্চান্নখানা চিঠি একসঙ্গে বাঁধিয়া একটি তাড়া করিয়া যূথীর শ্বশুরবাড়িতে হাজির হইল।

চাকরের মুখে শুনিল, বাবু বাহিরে, শীঘ্রই ফিরিবার কথা। অস্থিরভাবে সে রাস্তায় পাদচারণা করিতে লাগিল। দরোয়ান বলিল, মাজী কহ্‌তিহেঁ, বৈঠিয়ে ভিতরমে।

অগত্যা বৈঠকখানায় গিয়া সে গম্ভীরভাবে বসিল। কি করিয়া কথা আরম্ভ করিবে মনে মনে ভাঁজিতে লাগিল। রাস্তার দিকে সে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখে, পাশে টেবিলে রাখা চিঠির তাড়াটা তুলিয়া লইয়া যূথী দরজার দিকে চলিয়াছে। সে লাফাইয়া ওঠে, যূথী!

যূথী ভিতরে চলিয়া যায়, সেও অনুসরণ করিতে গেলে নেপালী বাহাদুর পথ আটকায়, অন্দর বাবুজী।

একজন নয়, চারিধারে বেয়ারা, বলপ্রয়োগের উপায় নাই। নিষ্ফল আক্রোশে সে বসিয়া পড়ে।

গোছা-করা সমস্ত চিঠি উনুনের মধ্যে যূথী ফেলিয়া দেয়, গনিয়া দেখিয়াছে পঞ্চান্নখানা। খানিকটা কাগজ-পোড়া গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া পৌছায়, একলার বাড়িতে প্রশ্ন করিবার কেহ নাই।

যূথীর মন হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া যায়, সেও কি কয়দিন ঘুমাইতে পারিয়াছে? কেবলই ভগবানকে ডাকিয়াছে। দুশ্চিন্তায় শরীর মন অবসন্ন তাহার।

আজ দুর্ভাবনা নিশ্চিহ্ন। সহজভাবে সে আসিয়া বলে, এত বড় প্রতিশোধপ্রিয় আর এতদূর হীন আপনি জানতুম না, নিজে অপরাধী হয়ে একজন মেয়ের চরমতম সর্ব্বনাশ করতে আপনার বাধছিল না?

একে প্রেম ব'লে প্রেমের অমর্য্যাদা করবেন না। আশা করি, আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার কিছু বক্তব্য নেই, আমাকে লেখা আপনার জঘন্য চিঠিগুলো সে কথা বলবে। আপনার বিয়ে হ'লে আমি পারতুম না সে চিঠি নিয়ে গিয়ে নববধূকে দেখাতে। এইখানে মেয়েতে পুরুষে তফাত। বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে। হ্যাঁ, আমি আপনাকে ঘৃণা করি।

একটা বিতাড়িত কুকুরেরও হয়তো সান্ত্বনা ছিল আবার ডাকিতে পারে বলিয়া, কিন্তু অলকের সেটুকুও ঘুচিয়া গিয়াছে। ইহার পর মুখে কিছু বলিতে যাওয়া মানে আরও অপমান ডাকিয়া আনা।

বছর কয়েক বাদে ছেলে মেয়ে ও স্বামীকে লইয়া পূজার কাপড় কিনিয়া ফিরিবার সময় সভয়ে যূথী দেখিল, বৌবাজারের চৌমাথায় তাহার মোটর রুখিয়াছে এক উলঙ্গ উন্মাদ। ড্রাইভার ধমক দিতেই সরিয়া গেল, দাড়িতে গোঁফে ধূলায় কাদায় কাহারও চিনিবার উপায় না থাকিলেও যূথী তাহাকে চিনিয়াছিল। নূতন-কেনা একখানা ধুতি কাচের ফাঁক দিয়া ফেলিয়া দিয়া সে চোখের কোণ মুছিল। পাট-করা কাপড়খানা কাঁধে ফেলিয়া যূথীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, একটা কাঁচি-সিগ্রেট আছে? চিঠি থাকে তো দাও, ডাকে দোব।

ছেলে-মেয়েরা হাসিয়া উঠিল।

পাগলের মা আলুথালু বেশে ছুটিয়া আসিয়া হাজার গাড়ির মাঝখানে ছেলের হাত ধরে। যূথীর বুকে ঠিক তাহার মতই আকুলতা—সেই বিপজ্জনক গাড়ি চলাচলের মাঝখানে অকুতোভয়মিশ্রিত।

কিন্তু রাস্তা খোলা পাইয়া ড্রাইভার স্পীড বাড়াইয়া দেয়, সকল দীর্ঘশ্বাস অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

ক্যাল্‌কাটা মেল এখনও যাতায়াত করে। পাটনা শহর তেমনই আছে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বকিতা

ক্ষমা করুন ১৯৪১ দেবী,
খিলছি বকিতা
(কবিতা লিখত সেকালে)
কে ÷ তুমি ?
ইস { কু (জল ÷ জ) } পালানো (ম × ন) নিয়ে
খেদেছি খোচ
(চোখ দেখত সেকালে)
ব্ল্যাক জাপান ? না,
বিস্‌মার্ক ব্রাউনও নয় !
সি [একার × মণ্ট] ক × আকার × লো।
Log উনমন
Tan উসখুস
তা ছাড়া
√ সে − নয় − তবু − সে
রোদ − 0
জ্যোৎস্না + ?
প্রদোষ × !
এবং···অথচ − রেকারিং !
মিয়ঁ, না মিয়, না 'মিয় ?
যাই হোক

(আমি + তুমি)^2

—

আ^{2}মি^{2} + তু^{2}মি^{2} + ২ আতুমি^{2}

এর মার নেই !

অবশ্য

(আমি × তুমি) ÷ সমাজ

অথবা

(এক্স – তাহারা) ÷ রাষ্ট্র

গোলমাল বাধাবে একদিন ।

কিন্তু

আকাশ-গুলিতে শোনা যাচ্ছে ঘড়ঘড়ানি

এরোপ্লেন-ছ্যাকড়ার ;

এল ব'লে !

প্যারাশুট-মার্কা আবেগে

তাই

হে ১৯৪১ দেবী

খোচ খেদে খিলছি বকিতা !

"বনফুল"

কণ্ডুপল্লীর জঙ্গল (বেজওয়াড়া)

শুভ্র জ্যোৎস্না-স্নাত গভীর অরণ্য ; নিস্তব্ধ রজনী। আমি একা। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি বনস্পতির আড়ালে। আহত শার্দ্দূল অনতিদূরে আমারই সন্ধানে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সঙ্কেত পাইতেছি শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনিতে। গতি কখন চঞ্চল, কখন মন্থর, কখন দ্রুত। মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে গুরুগম্ভীর বজ্রনিনাদের মত, তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলে মনে হয়, পাহাড়ের অটল পাথরগুলি এখনই বুঝি ধ্বসিয়া পড়িবে। তাহার পর অবর্ণনীয় নিস্তব্ধতা, পরক্ষণেই দারুণ যন্ত্রণা-মিশ্রিত গোঙানি, যেন অভিশাপের অন্তর্ভেদী বাণী।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে গুলি চালাইয়াছিলাম। ছোট ৩০০·২৫ বোর রাইফেলের টোটা মাথায় কিংবা হৃদয়ে লাগিলে এরূপটি ঘটিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গুলি এমন কোন একটি স্থানে লাগিয়াছিল, যাহা মারাত্মক জখম ছাড়া আর বেশি কিছু করিতে পারে নাই। হরিণ-শিকারে আসিয়াছিলাম, সুতরাং বড় রাইফেলের বোঝা বহন করা প্রয়োজন বোধ করি নাই। বীটারেরা যখন জঙ্গল ভাঙিয়া পশু তাড়াইয়া আনিতেছিল, তখন ভাবিতে পারি নাই, বিরাটাকার কুলীনবংশোদ্ভব বাঘের সহিত অকস্মাৎ এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটিবে। যে মহড়া লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহা একাধিক পশুর পথের সঙ্গমস্থল। এ রকমটি কচিৎ দেখা যায়। কারণ জঙ্গলে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ থাকায় প্রত্যেক জন্তু জাতি হিসাবে স্ব স্ব গন্তব্য পথ স্বতন্ত্র করিয়া থাকে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। হরিণ, শূকর, চিতার সঙ্গমস্থল এক। কুলীন শার্দ্দূলের চরিত্রে আভিজাত্যের অভাব কখনও দেখি নাই। উক্ত ভয়াবহ জন্তুটির পদচিহ্ন না পাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। আত্মরক্ষা ও শিকারের সফলতা সম্বন্ধে ৩০০·২৫ বোরই যথেষ্ট। ধূর্ত্ত ও

ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন লেপার্ড যদি আসিয়াও পড়ে, তাহা হইলে তাহার অভ্যর্থনার উপযুক্ত সম্মান দিতে আমার হস্তস্থ রাইফেল পিছাইয়া যাইবে না। পাঁচ ফার্লং স্থান পরিধি লইয়া বীটারেরা অর্দ্ধচক্রাকারে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আমি ছোট্ট এবং নিরীহ-দৃশ্য আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলাম। ইতিপূর্ব্বে বহু জঙ্গলে ঘুরিয়াছি, কিন্তু প্রশস্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া কখনও শিকার করি নাই। মাইলের পর মাইল সরলরেখাযুক্ত রাস্তাটি ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্যবেধী হিসাবে আমার সুনাম আছে। তথাপি অসুবিধা বোধ করিতেছিলাম; কারণ ডাইনের দিকে মুখ করিয়া রাইফেল ধরিয়া হঠাৎ বাঁয়ে ঘুরিয়া এক মুহূর্ত্তে টিপ করা সোজা নয়। সেইরূপ বাঁয়ের দিকে প্রস্তুত হইয়া থাকিলে ডাইনে ঘোরায় অসুবিধাও সমান। যাহা হউক, রাইফেল চালানো সম্বন্ধে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, সুতরাং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা এক রকম ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অরণ্য ক্ষীণ হইতে বীটারদের চীৎকার ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। আমি দক্ষিণ স্কন্ধে রাইফেলের বাঁট রাখিয়া একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। নিবিড় উত্তেজনায় আমার অন্তর থরথর কাঁপিতেছে। জঙ্গলের গভীরতা ভেদ করিয়া কখন কি বাহির হইয়া আসিবে ঠিক নাই। এক মুহূর্ত্তের অন্যমনস্কতা সব কিছু চেষ্টাই পণ্ড করিয়া দিতে পারে। প্রতিটি মুহূর্ত্তে হৃদ্‌স্পন্দন দ্বিগুণতর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ শুনিলাম খসখস পদশব্দ। অভিজ্ঞতায় বুঝিলাম, জানোয়ারটি ছোট। তথাপি প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। অদূরে নিকটে ঝোপটি নড়িয়া উঠিল। ঘোড়া টিপিয়াছিলাম প্রায়। হতাশ হইয়া গেলাম। পদশব্দ জানোয়ারের নয়, একটি ময়ূর রাস্তা পার হইয়া গেল। শিকারে এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। দমিলাম না।

মনে মনে স্থির করিলাম, এতখানি স্থান সম্মুখে রাখিয়া আর ভবিষ্যতে শিকার করিতে আসিব না। পাল্লার বাহিরে শিকার দেখিব, অথচ মারিতে পারিব না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে? হতাশার কারণ অনুসন্ধান করিতেই মনে পড়িল, গুম্ফহীন, মাকুন্দ সেই লোকটির কথা। অযাত্রাকে প্রাণ ভরিয়া অভিশাপ দিলাম। প্রাতঃকালে করজোড়ে "গুড মর্নিং" করিয়া ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট-এর মিলন আমার সামনে না ঘটাইলে কি আমি তাহার পাকা ধানে মই দিতাম?

অযাত্রার কথা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম। এই অবসরে একটি চতুষ্পদীয় আমাকে অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিবাদে সামনের জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। জন্তুটি বৃহদাকার নেউল। দুঃখের কারণ ছিল না। তথাপি নিজের অপ্রস্তুত অবস্থাকে ক্ষমা করিতে পারিলাম না। আবার সেই পারাবতবক্ষ, দীর্ঘকেশযুক্ত, ক্ষীণকলেবর কবিকে মনে পড়িল। মনকে দৃঢ় করিলাম। তাঁবুতে ফিরিয়াই, খাই বা না খাই প্রথমেই সেই জীবটিকে তাড়াইব। প্রয়োজন হইলে নিতান্ত বিনীত ও ভদ্র ভাষা ব্যবহার করিব এবং তৎসহিত প্রথম শ্রেণীর ভাড়া হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিব, তুমি অপয়া। অর্থের বিনিময়ে মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই সুযোগ প্রত্যাখান করা নিতান্তই বোকার কাজ হইবে। কেন? আমার শিকার-ব্যাধি তাড়াইবার জন্য পিসীমাই তো স্বস্ত্যয়নের স্রষ্টা গৃহপুরোহিতকে যথেষ্ট টাকা দিয়া থাকেন। আমি না হয় প্রথম শ্রেণীর ভাড়া বহন করিলাম।

সময় ইতিমধ্যে সন্ধ্যার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দুই দণ্ড উত্তীর্ণ হইতে চলিল, একটিও সিগারেট খাইবার অবসর পাই নাই। নেশার দুর্দ্দমনীয় মোহ আমাকে প্রায় কাবু করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু বন্দুক

ছাড়িয়া সিগারেট ধরাই কেমন করিয়া? রেডি ট্রিগার অসাবধানতা-বশত যদি ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে হরিণ অন্য দিকে পলাইবে।

রজকের বাড়িতে ঢাকাই শাড়ি দেখিয়া কল্পিত স্বত্বাধিকারিণীর প্রেমে পড়ে

এই সব কিছুর জন্যই দায়ী সেই আধ-মড়া কবি। রজকের বাড়িতে ঢাকাই শাড়ি দেখিয়া যে কল্পিত স্বত্বাধিকারিণীর প্রেমে পড়ে,

সে আর যাহাই হউক, ভেজালহীন অপয়া না হইয়া যায় না। এখান হইতে ফিরিয়াই কবিকে বেধড়ক মার দিব ঠিক করিলাম। পরক্ষণেই মনে হইল, কি সর্ব্বনাশ! সত্যই যদি মারিয়া বসি তো জঙ্গলের ভিতর অ্যাম্বুলেন্স-গাড়ি পাইব কোথা হইতে? অত্যন্ত দমিয়া গেলাম। জীবন্ত অপয়া, তাহাকেও ঠ্যাঙাইবার উপায় নাই।

দ্বিপ্রহর হইতে বন ঠ্যাঙানো চলিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত কিছু পাইলাম না, এবং যদি বা কিছু পাইলাম, তাহাও আবার ময়ূর ও নেউল। উহারা গেলে আবার অন্যমনস্ক হইলাম। সর্ব্বোপরি একটিও সিগারেট জোটে নাই। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে। এতগুলি অঘটনের যোগাযোগ ঐ অপয়াটাকে সঙ্গে না আনিলে ঘটিত না। পুনরায় এক ছাঁচে ঢালা কঙ্কালসার ওয়ান-ডাইমেন্‌শনাল তন্বীদের সেই কবিকে মনে পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস সহ নিজের দৃঢ়পেশীবহুল উলঙ্গ বাহুটি নানাভাবে ঘুরাইয়া দেখিলাম। তাহার পর আত্মাকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলিয়া, উহারা বোঝে না। না বুঝুক, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁবুতে ফিরিয়া ঐ কবিকে মারিবই ঠিক করিলাম। একান্তই যদি প্রয়োজন হয়, মারের পর ফার্স্ট এড প্রয়োগ করিলেই চলিবে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শিকারের ব্যর্থতায় মন দমিয়া গিয়াছিল। 'দুত্তোর' বলিয়া পার্শ্বে রাইফেলটি রাখিতে যাইব, অমনই কানের অতি নিকট দিয়া বোঁ করিয়া গুলি বাহির হইয়া গেল। অজ্ঞাতে ট্রিগার টিপিয়া ফেলিয়াছিলাম।

পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দের প্রতিধ্বনিতে মৃত্যুর বার্ত্তা জীবন্ত ও সচেতন অবস্থায় শুনিলাম। গুলি ও আমার মাঝে আনুমানিক অর্দ্ধ ইঞ্চির ব্যবধান না থাকিলে আজ এই শিকার-কাহিনী লিখিতাম না।

প্রতিধ্বনি এখন আর নাই। কিন্তু তাহার রেশ হৃদয়কে দারুণভাবে

আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। শিকারীর এই জাতীয় দুর্ব
শোভনীয় নয়। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিবার সাহস নাই। বা
সামনে বহুবার পড়িয়াছি, এবং বহুবার তাহাদের আক্রমণ হ
নিজেকে বাঁচাইয়াছি। কিন্তু সজ্ঞানে কখনও মৃত্যুকে এই ল
উপলব্ধি করি নাই।

আবার গুলি ভরিয়া লইলাম। এই ঘটনার পর বেশ খানি
সময় কাটিয়া গিয়াছে। অদূরে বীটারদের চীৎকারের পরিবর্ত্তে তাহা
অস্পষ্ট গলা শুনিতে পাইতেছি। হঠাৎ চীৎকার থামাইবার কারণ কি
অস্পষ্ট মন্ত্রণাই বা কেন? অনুমান করিলাম, একটা কিছু অ
ঘটিয়াছে। কি হইতে পারে? হয়তো বা লেপার্ড দেখিয়া থাকি
হউক না লেপার্ড, তাহাতে অতগুলি লোকের ভীত হইয়া পড়িবার ক
কি আছে!

আরও কয়েক মিনিট সময় কাটিল। ভাবিলাম, এই সুযোগে এ
সিগারেট ধরাইয়া লই। কোনও প্রকারে এক হস্তে সিগারেট
পুরিয়া বাজিকরের ভঙ্গিতে দিয়াশলাই জ্বালাইতে যাইব, এমন
দক্ষিণ দিকের জঙ্গল ভীষণভাবে নড়িয়া উঠিল। তাহার পরেই দেখি
একটি ছোটখাটো খড়ের ছাউনিযুক্ত কুটীরের চালা শূন্যে উড়িতে
চকিতে দিয়াশলাই সিগারেট ফেলিয়া রাইফেল তুলিয়া ট্রিগার টিপি
সঙ্গে সঙ্গে গুড়ু—ড়্—ড়্—ম্ শব্দে গুলি বাহির হইয়া গেল, এবং
মুহূর্ত্তে বন্দুকের আওয়াজকে নিষ্প্রভ করিয়া শার্দ্দূলের হুঙ্কার পারিপা
আবেষ্টনী কম্পিত করিয়া তুলিল। দেখিলাম, এক লম্ফে বাঘ
পার হইয়া সামনের জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যবশত শ
আমাকে দেখে নাই। বনের রাজা আহত হইয়াছে। এ অবস্থায়
কণ্টকময় ঝোপের ভিতর তাহার পিছনে যাই কেমন করিয়া?

গুলি যখন চালাইয়াছিলাম, তখন এমন সময় ছিল না যে, জন্তুটি আসলে কি দেখিয়া লই। সম্বর-হরিণও অনেক সময় লাফ মারিয়া শূন্যে উড়িয়া থাকে। গুলি চালাইবার পর হুঙ্কার শুনিয়া বুঝিলাম, বাঘ মারিয়াছি। এখন একটি মাত্র টোটা সম্বল। সাধারণত আমি পাঁচটি কামরাই টোটা ভরিয়া লইয়া থাকি। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। খোলা তিনটি গুলি বাহিরে ছিল, সেই কারণে নূতন প্যাকেট খুলিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। তাহা ছাড়া উপরি টোটা যখন মাল-বাহক কুলির নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে, তখন প্রয়োজন হইলে টোটার অভাব মোচন করিতে পারি। পিছন ফিরিয়া গুলির সন্ধান করিতে দেখিলাম, কুলি ইতিমধ্যে গা ঢাকা দিয়াছে।

আমি একা। দিনের আলো শেষ হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের বিরাট ছায়ার অন্ধকারে আমি ধীরে নিমজ্জিত হইতেছি। সব কিছুর অদ্ভুত সমাবেশে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলাম। বীটারদের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। নিশ্চিত বুঝিলাম, উহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে। আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল এখন একটিমাত্র টোটা। ইহা লইয়া শিকারের পিছনে ধাওয়া করা চলে না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মাঝে মাঝে বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। গাছে উঠিয়া রাত্রিটা যে কাটাইয়া দিব তাহারও উপায় নাই। ঘোরতর সামরিক প্রথায় সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছি। দুইজনের সাহায্যে পোশাক পরিয়াছিলাম। সুতরাং অন্তত একজন হাত না লাগাইলে কঠিন চামড়ার লেগিং ও বুটজুতা খোলা অসম্ভব। পরিচ্ছদকে স্মার্ট করিতে গিয়া যে চওড়া বেল্ট ও কষা ব্রীচেস পরিয়াছিলাম, তাহাতে মাথা নত করিবার উপায় নাই। সর্ব্বত্র লৌহবেষ্টিত বুট, একটু নড়িলেই মসমস আওয়াজ করিয়া উঠে। এই শব্দই শার্দ্দূলকে আহ্বান করিয়া আনিবার পক্ষে

যথেষ্ট। যদি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে অন্ধকারে তাহার মর্ম্মস্থল (বুক ও মাথা) সন্ধান করিব কেমন করিয়া? উপায়ান্তর না দেখিয়া একটি নাতিদীর্ঘ গাছের পিছনে আশ্রয় লইলাম।

কতক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম মনে নাই। অকারণ চলন মোটা দড়ির ভীতিপ্রদ চাপ ও গতি কোমর হইতে বুক পর্য্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলাম। নিশ্চিত বুঝিলাম, কোন সরীসৃপ আমাকে বেষ্টন করিয়া গাছে উঠিতেছে। আমি পাথরের মত নিশ্চল হইয়া গেলাম। নিশ্বাসও বুঝি তখন রোধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সাপটি হয় তেমন নয় অতি প্রাচীন রাজগোখরো। গাছের উপর পাখির বাসার সন্ধানে চলিয়াছে। ডিম্ব উহাদের উপাদেয় প্রিয় খাদ্য। একটির পর একটি কুণ্ডলী মুক্ত হইতেই স্থানত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কারণ সন্ধানের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, পদহীন জীবটি কিছুক্ষণ পরে যে পথে উঠিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিয়া আসিবে, এবং আমাকে বেষ্টন করিয়াই নামিবে।

এক পা অগ্রসর হইয়াছি, অমনই জুতা ও লেগিঙের ঘর্ষণে এমন একটি কর্কশ শব্দ হইল, যাহাকে মৃত্যুর নির্ভুল সঙ্কেত ছাড়া আর কিছু ভাবা চলে না।

এখন বুট না খুলিতে পারিলে বাঁচিবার আর কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কিন্তু খুলি কেমন করিয়া? কোন প্রকারে ছেলেবেলার মার্বেল খেলার অনুকরণে মাটিতে বসিতে পারিলে, তবেই এই সাময়িক পাদুকার কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। কারণ হস্তীপৃষ্ঠে হাওদায় আসীন কোন রাজপুরুষের এই চেষ্টার পর ব্রীচেসকে দর্জ্জী-বাড়ি পাঠাইতে হইয়াছিল। দর্জ্জীর সহায়তায় আপত্তি নাই, কিন্তু হাওদার আড়াল তো আমার নাই। তথাপি বেপরোয়া হইয়া পাদুকার উপর সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিলাম। জুতা খুলিল। কিন্তু লেগিং দুইটা আঁকড়াইয়া রহিয়া গেল। অনভিজ্ঞ কুলি কি ভাবে ফিতা বাঁধিয়াছিল বুঝিবার উপায় ছিল না। বেশটি দাঁড়াইল কতকটা পটিদার পোস্টাল পিয়নদের মত।

এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হইতেছি, আবার থামিতেছি। কি জানি, যদি গতিশীল জীব দেখিয়া বাঘ সন্দেহ করিয়া বসে। হিংস্র জন্তুর সন্দেহ জিনিসটা সব সময়ই বিপজ্জনক। ক্রমে বড় গাছটার পাশে প্রায় আসিয়া পড়িয়াছি। অকস্মাৎ একই সঙ্গে একাধিক মানুষের দীর্ঘ-নিশ্বাস শুনিলাম। তাহার পর সেই আওয়াজ হাঁপানির টানের মত লাগিল। সব কয়জনই যেন শ্বাসরোধ হইয়া মরিতে বসিয়াছে। আমার দেহের রক্ত-চলাচল স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। ভাবিলাম, অবশেষে অশরীরীর আক্রোশে পড়িলাম না তো? যে বাঘটিকে আহত করিয়াছি, তাহার সহিত ঐ জাতীয় গল্প জড়িত আছে। তবে কি বাস্তবিক বাঘ নয়? নিশ্চয় নয়। এতক্ষণ সাহস করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। এইবার সর্ব্বদেহে কেমন একটা শিথিলতা বোধ করিতে লাগিলাম। পিসীমা কোন্ দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতেন জানা ছিল না। তথাপি ভগবান অন্তর্য্যামী ভাবিয়া কায়মনে স্মরণ করিলাম। ফল হইল বোধ হয়। মনে বল পাইয়া মুক্তির আশ্রয় লইলাম। স্থির করিলাম, শব্দ জঙ্গলের হরিজন কঙ্কালখাদক হায়েনার। আহারের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম, বাঘ নিকটে নাই। কারণ বাঘে হায়েনায় সম্বন্ধ তেমন মধুর নয়। কিন্তু হায়েনাও যদি সদলে আসিয়া পড়ে, তাহাদের আক্রমণ হইতে বাঁচিব কেমন করিয়া? টোটা তো মাত্র একটি। আসলে উহারা প্রায় নেকড়ের জাতি। অন্য বিষয়ে যেটুকু পার্থক্যই থাকুক, হিংস্র প্রকৃতি উভয়ের

সমান। সুযোগ পাইলেই সদলে আক্রমণ করিয়া উহারা জীবন্ত প্রাণীর মাংস ছিঁড়িয়া খাইয়া থাকে।

গাছেও উঠিবার উপায় নাই। কারণ কোন ডালই নাগালের মধ্যে পাইলাম না। ফাটলের আশ্রয় লইয়া উঠিব, সে সাহসও নাই। তাহাদের অস্তিত্ব স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিতে যাইলে হয়তো বা কেউটে অথবা আর কোন বিষধরের মাথায় হাত বুলাইয়া ফেলিব। বাঘকে দেখিলে অন্তত শেষ সম্বল টোটার সাহায্য লইতে পারিব, কিন্তু সর্পের ছোবল হইতে মুক্তি নাই।

জীবনের শেষ সময় যে অতি নিকট, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। যে কয়টি জীব আমাকে ঘিরিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে যে কোন আমার সন্ধান পাইলেই ভবলীলা সমাপ্ত হইতে সময় লাগিবে না। আশ্চর্য্য উহাদের এত নিকটে যে, সন্ধান না পাওয়াটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। পিসীমার অবাধ্য হইয়াছি বলিয়া নিজের প্রতি ধিক্কার আসিতে লাগিল।

হঠাৎ সমস্ত পর্ব্বতচূড়া ধ্বনিত হইয়া উঠিল বাঘের রোষ-মিশ্রিত কঠোর আহ্বানে; আততায়ীকে সে বধ করিতে চায়। সামনের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, অন্ধকার অপসারিত হইয়াছে। রাস্তাটি জ্যোৎস্নায় প্লুত, কি ভাবে গভীর রাত্রের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি অনুমান করিতে পারিলাম না। আসন্ন মৃত্যুকে এইবার সহজভাবে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ক্ষুদ্র অস্ত্রটির সর্ব্বদেহে প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিলাম। হয়তো এখুনি তাহার নিকট চিরবিদায় লইতে হইবে। বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক দামী ও শক্তিশালী রাইফেল কিনিয়াছি এবং তাহাদের হারেমে স্ত্রী-ভোগের মতই ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু এই ৩০০·২৫ বোরকে নিরবচ্ছিন্ন ভোগের বস্তু ভাবি নাই। নিতান্ত আপনার এবং পরম বন্ধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছি, ভালবাসিয়াছি

ঠিক যে ভাবে আমার স্ত্রীকে অতি আপনার এবং পরম বন্ধু বলিয়া ভাবি। ৩০০·২৫ বোর বন্দুকটি যে আমার বাল্যের সাথী! হাতে খড়ি ইহার নিকটই হইয়াছিল। ওস্তাদের সুনামও ইহার নিকটই পাইয়াছিলাম। জঙ্গলের বিপদে এই অস্ত্রটি আমাকে কখনও অসহায় ভাবিতে দেয় নাই।

অস্ত্রটি হৃদয়ের অতি নিকটে টানিয়া লইলাম, নিতান্ত শিশুর মত নিবিড়ভাবে। কেমন করিয়া বুঝাইব, সেই মুহূর্ত্তে বাল্যসখী শিকারের সহধর্ম্মিণী ব্রোঞ্জমিশ্রিত কঠিন ইস্পাতের স্পর্শে কতটা সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম! কিন্তু আদরের সময় ইহা নয়। পরক্ষণেই বন্দুককে সংহারোপযোগী করিয়া স্কন্ধ ও বগলের মধ্যস্থলে বসাইলাম। ইহার ঠিক পূর্ব্বের ঘটনা প্রথম ছত্রে লিখিয়াছি।

* * *

গোঙানি শুনিয়া বুঝিলাম, হয়তো ব্যাঘ্র এইবার কাবু হইয়াছে। আর একবার গাছে উঠিবার চেষ্টা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় খস-খস-খস-খস-খস শব্দ নিকটে আসিতে লাগিল। প্রতিটি পদক্ষেপ মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছিল। শব্দ অনুসরণ করিয়া সেন্ট্রির মত প্রস্তুত হইলাম। হঠাৎ শুষ্ক পত্রের সাঙ্কেতিক ক্রিয়া থামিয়া গেল—অতি নিকটে। এইবার আমাদের বোঝা-পড়ার পালা। রাইফেল তুলিতেই দেখিলাম, বাঘ রাস্তার ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দাঁড়াইবার ভঙ্গি সহজ নয়, নিশ্চয় প্রথম গুলিতে মাজা ভাঙিয়া গিয়াছিল। ঝাপসা আলোয় কোন প্রকারে মাথা আন্দাজ করিয়া ট্রিগার টিপিলাম।

নিস্তব্ধ অরণ্য বিকট শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র

লম্ফপ্রদান করিল। আমাকে লক্ষ্য করিয়া নয়, যেদিক দিয়া আসিয়া সেই দিকে। সামনের ঝোপ ভাঙিয়া তছনছ হইয়া গেল। বা বিচিত্র আচরণে আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

রাত্রি ক্রমশই নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোৎস্নার আলো সব কিছুই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর দেখিতেছি। বাঘের আওয়াজ শুনিতে পাইতেছি না।

এই নিস্তব্ধতার পরের ঘটনা কি ঘটিবে অনুমান করিবার উ নাই। কারণ যে জঙ্গলে আসিয়াছি, তাহা অনাহূত বাঘ ছাড়া, চি লেপার্ড প্যান্থার নেকড়ে হায়েনা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবল পরা শালী অজগরের নিবাস-স্থল।

শরীর ঝিমঝিম করিতেছিল, তথাপি প্রাণের মায়ায় রাই উল্টাইয়া লাঠির মত ধরিলাম। সেই মুহূর্ত্তে মাথার ঠিক মধ্যস্থলে হইল বিষধর দংশন করিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই অনুভব করিলাম গ্যাঁজলা জমিয়া উঠিতেছে এবং লালা আঠার মত কঠিন ও চটচটে আসিতেছে। মাথাও যেন নেশায় টলিতেছে, আর দাঁড়াইয়া থা পারিলাম না, বসিয়া পড়িলাম। ঠেকা ব্যতীত বসিবার শক্তিও নাই, বেহুঁসের মত নিজেকে এলাইয়া দিলাম।

নিশ্চয় বেশিক্ষণ এই ভাবে ছিলাম না। জনমানবহীন অ অকারণ বহু লোকের চীৎকার ও তীব্র আলোকরশ্মিতে তন্দ্রাবেশ ক গেল। সন্দিগ্ধভাবে চোখ রগড়াইয়া দেখিলাম, বীটাররা মশাল জ্বা আমার সামনে কোলাহল করিতেছে।

দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই মাথাটা টলিয়া গেল। কিন্তু হাওয়ায় অল্প সময়ের ভিতরেই কতকটা সুস্থ বোধ করিলাম।

অদূরে গোযান অপেক্ষা করিতেছিল। মনুষ্যস্কন্ধে ভর দিয়া উ

কোন প্রকারে ভর দিয়া···উঠিলাম

যাইব, এমন সময় দেখি কাঁটাযুক্ত একটি গাছের ডাল আমার কোটে আটকাইয়া ঝুলিতেছে।

থাক, তাহা হইলে সর্পাঘাত হয় নাই! কণ্টকপূর্ণ নীরস তরুশাখাই মস্তকে বিদ্ধ হওয়ায় সর্পদষ্টের মত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আতঙ্ক কাটিতে সাহস পাইলাম। কোন প্রকারে দুইজনের স্কন্ধে ভর করিয়া গরুর গাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং প্রতি পদে দুর্গন্ধ কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া অবর্ণনীয় তৃষ্ণা ক্ষণে ক্ষণে নিবারণ করিলাম।

* * *

আজ আমি সুস্থ ও সবল। ভয় পাইলে মানুষ যে অযথা মরিতে পারে, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি কাঁটাযুক্ত নির্বিষ ডালের ছোবলে। এই অকারণ ভীতির জন্য মনস্তাত্ত্বিকদের নিকট শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। এই সঙ্গে আরও একটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা হইতেছে—অপরিস্রুত জল পান করিলে সুস্থ ও শক্তিসম্পন্ন ভদ্রসন্তানের প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা সব সময় থাকে না। আমার স্ত্রীর সহিত সশরীরে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বসবাস করিতেছি, তথাপি এই সত্যটি তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাইতে পারি নাই।

(আর্ট স্কুল, মাদ্রাজ) শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

রুশ-জার্মান

"খুনসুড়ি আর খুনোখুনি চলছে বিশ্ব জুড়ে,
খুন্‌তি হাতে উড়ে বামুন, দেখছি ঠাকুরঝি—
ঠাকুর-জামাই আফিস-ফেরত আজকে আসবে কি?"
ননদ হাঁকে, "বালি যে ছাই মটকা-ভরা গুড়ে!"

দেবী

লোকে বলিত, দেবী।

দেবীই বটে। দেবকন্যার মত রূপ, দেবীর মতই স্নিগ্ধ প্রশান্ত মুখশ্রী—যেখান দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন, মনে হইত যেন তাঁহার চরণস্পর্শে ধূলিও মালিন্য মুছিয়া শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম কুমারী। বয়স তাঁহার তখন পনরো কি ষোলো, আমার চেয়ে মাস-কয়েকের মাত্র বড় ছিলেন। সেজকাকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের কথা হইল, বড়দের সঙ্গে আমিও মেয়ে দেখিতে গেলাম। দেখিয়া মনে হইল, এ রূপ মানুষের জন্য নয়, মানুষের পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে, স্বর্গের পারিজাতবনে ইহার স্থান। ইঁহাকে ঘিরিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার মত ঔজ্জ্বল্য আমাদের নাই, ভাবিয়া মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সত্যই সেদিন মনে হইয়াছিল, আমাদের পরিবারে ইঁহার বিবাহ না হওয়াই ভাল, ইঁহার যোগ্য মর্য্যাদা আমরা দিতে পারিব না।

তারপর তাঁহাকে দেখিলাম কল্যাণী বধূর বেশে। ক্ষীণ কয়টি চম্পক অঙ্গুলির স্পর্শে চক্ষের পলকে আমাদের সংসার যেন রূপে রসে ধন্য হইয়া উঠিল। দেহের রূপই তাঁহার দেখিয়াছিলাম, মনের মধ্যে যে কতগুণ তীব্র রূপের উন্মাদনা তিনি বহন করিতেন, তাহা এইবার দেখিলাম। স্বভাবত আমাদের পরিবারটা গাম্ভীর্য্যধর্ম্মী; প্রেম ও কৌতুক লইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ ইহার কেহই করে না। সেই চিরাচরিত সংযমের প্রাচীরে তিনি ভাঙন ধরাইয়া দিলেন, বিবাহিত নবজীবনের আনন্দে তাঁহার দেহে মনে যে উচ্ছ্বাসের প্লাবন জাগিল, তাহার আঘাতে সে প্রাচীর খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। গভীর রাত্রে তাঁহার অকস্মাৎ উৎসারিত হাসির মূর্চ্ছনা বাড়িসুদ্ধ লোককে সচকিত করিয়া তুলিত; সময়ে অসময়ে সেজকাকাকে লইয়া এবং তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কৌতুক-

বুদ্বুদের যে কণিকাগুলি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়িত, তাহার স্পর্শে যেন বাড়ির সকলেরই চক্ষে ঘোর লাগিয়া গেল। ইহা অন্যায়, আমাদের পরিবারের প্রচলিত রীতির সহিত ইহা মেলে না—এ কথা সেদিন কাহারই মনে হইল না; বরং তাঁহার এই সহজ আনন্দের ছোঁয়া লাগিয়া অন্য সকলেও যেন সেই আনন্দেই অভিষিক্ত হইয়া উঠিলেন। সংসারের মধ্যে আমরা দুইজনে ছিলাম সমান-বয়সী। একসঙ্গে দুইজনের সারাদিন কাটিত, কিন্তু সে সাহচর্য্যের গল্প অপরকে শুনাইব না, অপরে তাহা বুঝিবে না।

তারপর, একদিন যেমন অতর্কিতে আমাদের সংসার তাঁহাকে পাইয়া আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছিল, তেমনই অতর্কিতে আবার এক দিন সে সংসারের সমস্ত দীপ্তি তাঁহাকে ঘিরিয়াই নিবিয়া গেল। সেজকাকা রেল-কলিশনে মারা গেলেন।

রাত্রি দশটায় তাঁহার বাড়ি পৌঁছিবার কথা ছিল। আটটায় কলিকাতায় টেলিগ্রাম আসিল; রাত দুইটায় মৃতদেহ আসিয়া পৌঁছিল।

বাড়িতে কান্নাকাটি চলিতে লাগিল; কিন্তু যাঁহাকে লইয়া এত বিলাপ, তিনি নিজে একবিন্দু চোখের জল ফেলিলেন না—বারান্দার রেলিং ধরিয়া দিগন্তে অস্ত-পাণ্ডুর চাঁদের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে ধ্যান কেহ ভাঙাইতে পারিল না। আমি একবার ডাকিতে গিয়া আবার নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিলাম—ডাকিতে সাহস হইল না।

পরদিন হইতে তাঁহার আর একটি রূপ দেখিলাম। স্নিগ্ধ কল্যাণী বধূর করুণাসজল দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তে যে কি করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার রহস্য আমি আজও ভেদ করিতে পারি নাই। এতখানি কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষমতা তাঁহার মধ্যে ছিল, ইহা কেহ কোনদিন কল্পনা করে নাই। নিরাভরণ নিরলঙ্কার তাঁহাকে দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ মানুষ প্রকাশ্যে এবং মনে মনে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও কোন নির্ব্বন্ধেই তিনি একগাছা

চূড়িও হাতে রাখিতে রাজি হইলেন না। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের রাশি নিজের হাতে কাটিয়া ফেলিলেন; অঙ্গের আভরণ নিঃশেষে ঘুচাইয়া ফেলিয়া সেই লাস্যময়ী রাজেন্দ্রাণী এক নিমেষে তপঃশীলা ব্রহ্মচারিণীতে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন।

সেই কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোরতা কুড়ি বৎসর পরেও এতটুকু শিথিল হয় নাই—দেশের লোকে তাঁহাকে দেবী বলিয়াই জানিয়াছিল। সে সংযম-সাধনার মধ্যে তাঁহার কৃত্রিমতা ছিল না, আড়ম্বরও ছিল না।

তাহার পর আবার তাঁহার মৃত্যুও দেখিয়াছি। পরিণত বয়সে শত পরিজনের অশ্রুবর্ষণের মধ্যে দেবী দেবলোকে চলিয়া গেলেন, সে জীবনকে ছাড়িয়া গেলেন, তাহার জন্য এক বিন্দু চোখের জল সেদিন পড়িল না।

তাঁহার অনেক কথাই আমার মনে জাগিয়া আছে; আরও যতদিন বাঁচিব, থাকিবে। কিন্তু সকলের চেয়ে স্পষ্ট হইয়া মনে রহিয়াছে একটি কথা।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। বাড়ি ফিরিয়া সেই ভ্রমণের কাহিনী আমাকে শুনাইতে শুনাইতে এক সময়ে হঠাৎ বলিলেন, পুরীতে একদিন ভারি মজা হ'ল—তেল দিয়ে নুন দিয়ে লঙ্কা দিয়ে গরম গরম মুড়ি মেখে নিয়ে খুব মজা ক'রে খেলাম।

সেই এক মুহূর্ত্তের জন্য যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল। শত কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও মানুষের যে সহজ মন তাঁহার মধ্যে বাঁচিয়া ছিল, তাহার যেন চকিতে একবার দেখা পাইয়াছিলাম। মনে পড়িয়াছিল, প্রথম বয়সে তেল নুন দিয়া মুড়ি খাইতে তিনি ভালবাসিতেন।

লোকে তাঁহাকে দেবী বলিয়া জানিয়াছে। দেবীত্বের প্রস্তরাবরণের তলায় অলক্ষ্যে যে মানুষটি মৃত্যু এড়াইয়া বিরাজ করিতেছিল, আমার মনে সেই সত্য হইয়া রহিল।

"সম্বুদ্ধ"

সংবাদ-সাহিত্য

Walter Theimer সম্পাদিত 'দি পেঙ্গুইন পলিটিকাল ডিক্‌শনারি'তে গোয়েব্‌ল্‌স সম্পর্কে এইরূপ লিখিত হইয়াছে (ইটালিক্‌স আমাদের)—

Goebbels, Dr. Joseph, German Minister of Propaganda,.....Born October 29, 1897, at Rheydt, Rhineland, graduated Ph. D. at Heidelberg in 1920. Was a journalist in the Rhineland,...built up a propaganda machine of unheard of size and efficiency....*Skilful methods* were developed...*to focus the limelight on the points which Germany wished to put in the foreground*, to intimidate the adversaries, to play on their nerves by *monthlong extension of the campaigns* and well-schemed gradual increase in their vehemence. It may be said that Germany owed her initial political successes, won in a "war of nerves", as much to Dr. Goebbel's *unscrupulous propaganda* as to any other factor. *Truth has been no consideration* in this system.

* * *

পড়িবামাত্র আমাদের শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে স্মরণ হইল; উক্ত অভিধানের সি (C) ও আর (R) তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কুত্রাপি তাঁহার নাম পাইলাম না। স্মরণ হইল, আমরা নিতান্ত পরাধীন জাতি, অবহেলা ও লাঞ্ছনা আমাদের অঙ্গের ভূষণ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে প্রোপাগাণ্ডা-সম্রাট রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম ও পরিচয় যে কোনও পলিটিকাল ডিক্‌শনারির কয়েক পৃষ্ঠা জুড়িয়া দেখিতে পাইতাম। শ্রীমান গোয়েব্‌ল্‌স তো তাঁহার কাছে অর্ব্বাচীন অপোগণ্ড শিশু! তবে তাঁহার ভরসা এই, বাঁচিয়া থাকিলে এবং 'প্রবাসী'-বাংলা ও 'মডার্ন-রিভিউ'-ইংরেজী শিখিতে পারিলে প্রবীণ ও গুরুপ্রতিম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এখনও অনেক কিছু আদায় করিতে পারিবেন; সত্য সত্যই জ্ঞাত হইবেন—skilful method to focus the lime-light on the points which he wishes to put in the foreground এবং unscrupulous propaganda কাহাকে বলে! আমাদের পাঠক-সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য এই ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্ গোয়েব্‌ল্‌স-এর সামান্য একটি "মেথড" লইয়া আলোচনা করিব। Truth has been no

চুড়িও হাতে রাখিতে রাজি হইলেন না। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের রাশি নিজের হাতে কাটিয়া ফেলিলেন; অঙ্গের আভরণ নিঃশেষে ঘুচাইয়া ফেলিয়া সেই লাস্যময়ী রাজেন্দ্রাণী এক নিমেষে তপঃশীলা ব্রহ্মচারিণীতে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন।

সেই কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোরতা কুড়ি বৎসর পরেও এতটুকু শিথিল হয় নাই—দেশের লোকে তাঁহাকে দেবী বলিয়াই জানিয়াছিল। সে সংযম-সাধনার মধ্যে তাঁহার কৃত্রিমতা ছিল না, আড়ম্বরও ছিল না।

তাহার পর আবার তাঁহার মৃত্যুও দেখিয়াছি। পরিণত বয়সে, শত পরিজনের অশ্রুবর্ষণের মধ্যে দেবী দেবলোকে চলিয়া গেলেন, সে জীবনকে ছাড়িয়া গেলেন, তাহার জন্য এক বিন্দু চোখের জল সেদিনও পড়িল না।

তাঁহার অনেক কথাই আমার মনে জাগিয়া আছে; আরও যতদিন বাঁচিব, থাকিবে। কিন্তু সকলের চেয়ে স্পষ্ট হইয়া মনে রহিয়াছে একটি কথা।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। বাড়ি ফিরিয়া সেই ভ্রমণের কাহিনী আমাকে শুনাইতে শুনাইতে এক সময়ে হঠাৎ বলিলেন, পুরীতে একদিন ভারি মজা হ'ল—তেল দিয়ে নুন দিয়ে লঙ্কা দিয়ে গরম গরম মুড়ি মেখে নিয়ে খুব মজা ক'রে খেলাম।

সেই এক মুহূর্ত্তের জন্য যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল। শত কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও মানুষের যে সহজ মন তাঁহার মধ্যে বাঁচিয়া ছিল, তাহার যে চকিতে একবার দেখা পাইয়াছিলাম। মনে পড়িয়াছিল, প্রথম বয়সে তেল নুন দিয়া মুড়ি খাইতে তিনি ভালবাসিতেন।

লোকে তাঁহাকে দেবী বলিয়া জানিয়াছে। দেবীত্বের প্রস্তরাবরণের তলায় অলক্ষ্যে যে মানুষটি মৃত্যু এড়াইয়া বিরাজ করিতেছিল, আমার মনে সেই সত্য হইয়া রহিল।

"সমুদ্ধ"

সংবাদ-সাহিত্য

Walter Theimer সম্পাদিত 'দি পেঙ্গুইন পলিটিকাল ডিক্‌শনারি'তে গোয়েব্‌ল্‌স সম্পর্কে এইরূপ লিখিত হইয়াছে (ইটালিক্‌স আমাদের)—

Goebbels, Dr. Joseph, German Minister of Propaganda,.....Born October 29, 1897, at Rheydt, Rhineland, graduated Ph. D. at Heidelberg in 1920. Was a journalist in the Rhineland,...built up a propaganda machine of unheard of size and efficiency....*Skilful methods* were developed...*to focus the limelight on the points which Germany wished to put in the foreground*, to intimidate the adversaries, to play on their nerves by *monthlong extension of the campaigns* and well-schemed gradual increase in their vehemence. It may be said that Germany owed her initial political successes, won in a "war of nerves", as much to Dr. Goebbel's *unscrupulous propaganda* as to any other factor. *Truth has been no consideration* in this system.

* * *

পড়িবামাত্র আমাদের শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে স্মরণ হইল; উক্ত অভিধানের সি (C) ও আর (R) তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কুত্রাপি তাঁহার নাম পাইলাম না। স্মরণ হইল, আমরা নিতান্ত পরাধীন জাতি, অবহেলা ও লাঞ্ছনা আমাদের অঙ্গের ভূষণ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে প্রোপাগাণ্ডা-সম্রাট রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম ও পরিচয় যে কোনও পলিটিকাল ডিক্‌শনারির কয়েক পৃষ্ঠা জুড়িয়া দেখিতে পাইতাম। শ্রীমান গোয়েব্‌ল্‌স তো তাঁহার কাছে অর্ব্বাচীন অপোগণ্ড শিশু! তবে তাঁহার ভরসা এই, বাঁচিয়া থাকিলে এবং 'প্রবাসী'-বাংলা ও 'মডার্ন-রিভিউ'-ইংরেজী শিখিতে পারিলে প্রবীণ ও গুরুপ্রতিম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এখনও অনেক কিছু আদায় করিতে পারিবেন; সত্য সত্যই জ্ঞাত হইবেন—skilful method to focus the lime-light on the points which he wishes to put in the foreground এবং unscrupulous propaganda কাহাকে বলে! আমাদের পাঠক-সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য এই ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্ গোয়েব্‌ল্‌স-এর সামান্য একটি "মেথড" লইয়া আলোচনা করিব। Truth has been no

consideration in his system! স্থানাভাব না হইলে চা, কয়
মাদুলি, অবাঙালী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বাংলা পুস্তকের ব্যবসায়, রামমোহ
রায়ের জন্ম-তারিখ, রাজারামের ছবি, আশুতোষ মুখুজ্জে, রঙ্গম
নারীদের অভিনয়, সিনেমা-তারকা প্রভৃতি গুরুতর বিষয় লইয়া তি
কি ভাবে সত্যনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিতে পারিতা
বিজ্ঞাপনের খাতির উপেক্ষা করিয়াও সত্যকে আঁকড়িয়া থাকা কত কঠি
তাহা আমরা জানি এবং জানি বলিয়াই তাঁহার দৃঢ়তায় বিস্ময়বি
হইয়া পড়ি। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন ও সন্তান-জামাতা
লইয়া ইঁহার লাইম-লাইট ফোকাসিং ও আনক্রুপুলাস প্রোপাগাণ্ড
তুলনা হয় না। ইঁহাকে গোয়েব্‌ল্‌স আখ্যা দিলে গোয়েব্‌ল্‌স
খাতির করা হয় বটে; কিন্তু ইঁহাকে অসম্মান করা হয়। আমাদে
দুর্ভাগ্য, হিমালয়ের উচ্চতা ও প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা মাপিবে
আমাদিগকে ফুট-গজের মাপকাঠি ব্যবহার করিতে হইতেছে।

* * *

অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে রামরাম বসু নামক একজন হতভা
বাঙালী বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ভদ্রলোকের অপরা
তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা মৌলিক গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া বসেন, এবং এ
ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রকাশ করেন। জন্মকালে ইনি যদি ঘুণাক্ষরেও জানি
পারিতেন যে, তাঁহার জন্মের সাতাশ বৎসর পরে বাংলা দেশে এ
একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, যাঁহার স্কন্ধে বাঙালীকৃত মৌলি
যাবতীয় ব্যাপারেরই কৃতিত্বই ছলে বলে কৌশলে চাপানো হইবে, তা
হইলে বসু মহাশয় (তাঁহার হাতে ক্ষমতা থাকিলে) নিশ্চয়ই অ
শতাব্দীকাল বিলম্বে জন্মগ্রহণ করিয়া সকল দিক বজায় রাখিতেন। কি
ভুল যাহা ঘটিবার, পলাশীর যুদ্ধের বছরেই তাহা ঘটিয়া গিয়াছি
সুতরাং গুরু রামমোহন যখন হামাগুড়ি দিতেছিলেন, শিষ্য রামরাম ব
তখন নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও বহুবিধ বিদ্যায় লায়েক হইয়া উঠিয়াছিলে
ভাগ্য-বিড়ম্বনা ইহাকেই বলে।

* * *

রামরাম বসুর কোনও বিস্তৃত ইতিহাস নাই—থাকা সম্ভবও ন
ভারতীয় হিন্দুরা বিশেষ করিয়া বাঙালীরা, জীবনী ও ইতিহাস রচ

কোনও কালেই দক্ষ নয়। এই বস্তুটি সম্পূর্ণ পশ্চিমের আমদানি এবং পশ্চিমের মতে আমরা তখন নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে "মা মা" বলিয়া হাতড়াইতেছি। বাংলা দেশে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা আসিলেন, তারপর মিশনরিরা আসিলেন। শেষোক্তদের সদুদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টের ও ইংরেজের মহিমা-প্রচার। নিজেদের কীর্ত্তি-কাহিনীর পরিচয় তাঁহারা খুব ভাল করিয়াই রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্পর্কে যে সকল হতভাগ্য নেটিব জীবেরা আসিয়াছিল, তাহাদের পরিচয় প্রসঙ্গত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেইটুকুই আমাদের পরম লাভ।

* * *

রামরাম বসুর সহিত স্বদেশের কোনও সম্পর্কই ছিল না, তিনি যেন এ দেশের লোকই ছিলেন না, যৌবনকাল হইতেই সাহেবদের অন্নে পুষ্ট, সাহেবদের ধর্ম্ম-মতে (ধর্ম্মে নয়) দীক্ষিত এবং সাহেবদের আশ্রয়ে মানুষ, তিনি এক পরভৃত জাতীয় জীব ছিলেন। মিশনরি সাহেবেরা তাঁহাকে যেমন অন্নে জীবিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই তেমনই তাঁহাকে কীর্ত্তিতেও জীবিত রাখিয়াছেন—রামরামের রচনাগুলিও তাঁহারাই প্রকাশ ও প্রচার করেন। সুতরাং রামরাম বসু সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে, এই মিশনরিদের নিজেদের বিবৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইবে।

* * *

দুঃখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর প্রায় চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত এই কার্য্য কেহ করেন নাই। বাঙালী-লিখিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামরাম বসুর কোনও পরিচয় নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহন-শিষ্যেরা যখন প্রবল ও প্রতিপত্তিশালী, তখন বাংলা গদ্যের জনক হিসাবে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র লেখক রামরাম বসুর কথা স্বতই উঠিয়াছিল, এবং তাঁহারা গুরুর প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসে স্বতই প্রচার করিয়াছিলেন যে, রামরাম বসু রামমোহনের শিষ্য না হইয়াই পারে না—যেহেতু তাঁহার কৃপা ব্যতীত বাংলা দেশে কেহই কোনও অঘটন ঘটাইবার অধিকারী ছিল না।

* * *

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এইটুকু

বিশ্বাস লইয়াই এক আজগুবী কাহিনীর সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়ের মারফৎ ('প্রতাপাদিত্য') তাহা বাংলা দেশে প্রচার করিলেন। প্রতিবাদ করিবার কেহ ছিলেন না, কারণ কেহই কিছু জানিতেন না। কিছুকাল পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্ভবত লজ্জা হইয়া থাকিবে, তিনি শ্যামল বর্ম্মা এই বেনামীতে ডক্টর সুশীলকুমার দের পুস্তক-সমালোচনাচ্ছলে প্রমাণ করিলেন যে, নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের পুস্তকের ভূমিকার (বিদ্যাভূষণের সরবরাহ করা) মালমসলা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংক্রান্ত সরকারী কাগজপত্র হইতে রামরাম বসুর কর্ম্মজীবনের ইতিহাস প্রচার করেন। পরে শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের ফলে রামরাম বসুর মিশনরি সংস্রবের ইতিহাসও কিয়ৎ-পরিমাণে উদ্ঘাটিত হয়। রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভূমিকায় রামরাম বসু সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। বৃদ্ধ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ সকলই অবগত আছেন, যেহেতু তিনি রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউসের উক্ত গ্রন্থখানি স্বয়ং 'প্রবাসী'তে প্রশংসার সহিত সমালোচনা করিয়াছেন।

* * *

কিন্তু তাহাতে রামমোহন ফাঁসিয়া যান! এই সময়টা কিছুকালের জন্য রামমোহনের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে রামানন্দের যে সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহার প্রমাণ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'র পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। পরে যে কারণেই হউক, তাঁহার রামমোহন-প্রীতি দ্বিগুণ হইয়াছে, এবং অবিশ্বাস-যুগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি ভাল করিয়াই করিতেছেন। এখানেই ভারতীয় গোয়েব্‌ল্‌সের জয়জয়কার।

তিনি স্বয়ং কিছু করেন না, যে সমাজের ক্ষতি করিতে চান, তিনি সেই সমাজেরই পাষণ্ডদের ধরিয়া তাহাদের সাহায্যে আপনার মতলব প্রচার করিয়া থাকেন, এটি খাস গোয়েব্‌ল্‌সের উপরেও ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট। রমাপ্রসাদ চন্দের অভাব হইলেও, মনোমোহন ঘোষদের অভাব হয় না—কখন হইবেও না।

* * *

রামরাম বসু সম্পর্কে রামমোহনকে ভিণ্ডিকেট করিবার জন্য

ঘোষপুঙ্গব মনোমোহন অবতীর্ণ হইলেন; চৈত্র (১৩৪৭) 'প্রবাসী'তে তিনি ছোট্ট একটি "আলোচনা" ছাড়িলেন, তাহাতে অমূল্য বিদ্যাভূষণের উদ্ভট কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া অনেক পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ রামানন্দ অল অ্যালং জানেন এগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা—স্বল্পবুদ্ধি ঘোষ মহাশয় হয়তো সরল বিশ্বাসেই ভুল করিয়াছেন। আমরা 'শনিবারের চিঠি'র গত চৈত্রের 'সংবাদ-সাহিত্যে' ঘোষ মহাশয়ের ভুল দেখাইয়া দিই। বাস্, এইখানেই ঘটনা চুকিয়া যাইবার কথা। কিন্তু শুধু ঘোষ তো নয়, গোয়েব্‌ল্‌সও ইহার মধ্যে আছেন যে! Truth has been no consideration in his system: সুতরাং শ্রাবণে আবার ঘোষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এবার বড় প্রবন্ধ, "রামরাম বসুর জীবন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ"। দুধ-ঘোল-মার্কা যুক্তির বহর যদি দেখিতে চান, তাহা হইলে এই প্রবন্ধটি পড়িতে হইবে। আমরা ঘোষ মহাশয়কে দোষ দিই না, বাহাদুরি দিই গোয়েব্‌ল্‌সকে। তিনি জানিয়া শুনিয়া মাসের পর মাস এই মিথ্যা পত্রস্থ করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু নিরীহ ঘোষপুঙ্গবও এবারে নিতান্ত নিরীহ নাই; এক কাঠি উপরে গিয়াছেন। দুধে জল মিশান নাই, জলে দুধ মিশাইয়াছেন। আমরা ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার বহুলপ্রচারের কথা বলিয়াছিলাম, ঘোষ মহাশয় লঙের ক্যাটালগ হইতে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' সম্পর্কে একটি মন্তব্য ছাপাইয়া সাধারণভাবে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে আমাদের উক্তি ভুল। লঙের ক্যাটালগ যে বেদ নহে, এ যুগের ছেলেরাও তাহা জানে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সামান্য ভদ্রজ্ঞান থাকিলে ঘোষ মহাশয় জানিতে পারিতেন যে, উক্ত পুস্তকের কমপক্ষে ত্রিশটি সংস্করণ হইয়াছিল। ১৮০৫ সালে প্রথম, ১৮১১ সালে দ্বিতীয়, ১৮১৭ সালে তৃতীয় এবং ১৮৩৪ সালের পর অন্তত ২৫ বার। স্বয়ং লঙই এই পুস্তকের সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সমগ্র প্রবন্ধটি লইয়া বিচার করিতে গেলে স্থান ও সময়ের অযথা অপব্যয় হইবে, একটি কথা বলিলেই পাঠকেরা এই প্রবন্ধের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবেন। ঘোষ লিখিতেছেন—

রাম বসুর সম্বন্ধে কেরী যা লিখেছেন তার অধিকাংশই তার Journal বা

দিনলিপির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ দিনলিপি কখনো সমগ্রভাবে মুদ্রিত হয় নি Memoirs of William Carey (London 1836) নামক পুস্তকে এ দিনলি কিয়দংশমাত্র মুদ্রিত হয়েছে।

এই উক্তি আদৌ সত্য নহে। বঙ্গদেশে মিশনের কার্য্য কি অগ্রসর হইতেছে তাহা মূল সভাকে (কেটারিং) পত্রযোগে জানাই হইত। মূল সভা এইগুলি তাঁহাদের Periodical Account মুদ্রিত করিতেন। শ্রীরামপুরে আসিবার পর কেরীর কার্য্যভার এ বৃদ্ধি পায় যে, তিনি নিয়মিত জার্নাল রক্ষা ও তাহা মূল সভায় প্রে করিতে পারেন না। এই কারণে মূল সভা বিস্তর অনুযোগ করেন, কেরী তাঁহার উত্তর দেন। এগুলিও Periodical Accounts-এ মু আছে। অর্থাৎ কেরী-লিখিত জার্নাল-এর প্রত্যেকটি পংক্তিই মু হইয়াছে। এক টুকরাও অমুদ্রিত নাই। Periodical Accoun গুলি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয় (Clipston Printed by J. W. Morris); প্রথম সিরিজ অর্থাৎ ১৭৯২ হই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। রামরাম বসু ১৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। সুতরাং রামরাম বসু সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এ ছয় খণ্ড পিরিয়ডিকাল অ্যাকাউণ্ট্‌স-এই আছে। ইউস্টেস কেরী তাঁ *Memoirs of William Carey* পুস্তকে এই ছয় খণ্ড পিরিয়ডিক অ্যাকাউণ্ট্‌স হইতেই তাঁহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

* * *

আর একটি কথা, ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসুর বয়স যে ৩৫ ছি সে সম্বন্ধে টমাসের প্রথম (মূল সভার নিকট প্রদত্ত) বিবৃতিতে উল্লেখ আছে। ঘোষ মহাশয় টমাসের উক্তিকে উড়াইয়া দিবার জন্য সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা হাস্যকর ও বালসুলভ। যু এই—তিনি বিদেশী লোক, সুতরাং ১৯।২০-কে ৩৫ মনে করা তাঁ পক্ষে অসম্ভব নয়; তাহা ছাড়া টমাসের মাথার ঠিক ছিল না, সু ভুল বকাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব। ঘোষ মহাশয় যদি টমাসের বি কোনও দিন দেখিবার সুযোগ পান তো দেখিবেন যে, তাহাতে রাম

বসুর "Wife and Children"-এরও উল্লেখ আছে।* ১৯ বছরে Children একটু বেশি ঘোষ-মার্কা নয় কি? টমাসের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে, ১৭৯২ সালে তিনি শক্ত সমর্থ সুস্থ মানুষ ছিলেন।

* * *

এই সকল ভ্রান্তি ও মিথ্যাচারের জন্য আমরা ঘোষ মহাশয়কে বিন্দুমাত্র দোষী করিতেছি না; তিনি বিশেষ দলের বিশেষ উদ্দেশ্যে "নিযুক্ত" ব্যক্তি—গালগল্পের আশ্রয় তাঁহাকে লইতেই হইবে। তবে সামাজিক কারণে তাঁহার বুদ্ধিটা এখনও পাকে নাই বলিয়া সকল দিক সামলাইয়া মামলা সাজাইতে পারেন নাই। কিন্তু গোয়েব্‌ল্‌স তো সবই জানেন। তিনি পাকা হইয়া এই সব কাঁচা কাজ করিতেছেন কেন, ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। বর্ত্তমানের প্রয়োজনের পক্ষে truth no consideration হইলেও truth যে একদিন প্রকাশ পায়, এমার্সনের ভক্ত ছাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তাহা জানা উচিত ছিল।

—

সব্যসাচী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত আভিধানিক অর্থ যাহাই হউক, ইহার ব্যবহারিক অর্থ চোর-ডাকাত। সব্যসাচী অর্জ্জুন কুরুদের উত্তর-গোগৃহ হইতে গোধন হরণ করিয়াছিলেন, 'পথের দাবী'র সব্যসাচী আইনত ভাল লোক ছিলেন না। সম্প্রতি দেখিতেছি, আমাদের বাংলা সাহিত্যের 'সব্যসাচী' নন্দগোপাল সেনগুপ্তও চুরি-চামারি ধরিয়াছেন। সব্যসাচী নামটাই ভাল নয়।

নন্দগোপাল সব্যসাচী কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিবেন, উটি তাঁহারই দেওয়া নাম। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ নন্দগোপালকে লিখিত একটি ব্যক্তিগত পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঐ বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভাল মানুষ নন্দগোপাল ব্যক্তিগতকে সমাজগত করিতে বিলম্ব করেন নাই। একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছেই সব্যসাচী ছিলেন, আজ তিনি সকলের কাছেই সব্যসাচী।'

* "I should have baptized him, but his relations refused to give him his wife and children."—পিরিয়ডিকাল অ্যাকাউণ্টস, ভলুম ১, পৃ. ১৩

এই সব্যসাচীর 'ধোঁয়া' উপন্যাস পড়িয়াছেন? না পড়িলেও বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকিবেন। নিরীহ দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং আজকাল এই সকল ভাল ভাল উপন্যাসের বিজ্ঞাপন বাবদ অনেক পয়সা ব্যয় করিতেছেন। এই উপন্যাসের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৭, মূল্য দুই টাকা। ইহার ১ হইতে ৮৪ পৃষ্ঠায় একটি গল্প আছে; ৮৫ হইতে ২২৭ পাতায় আছে ২৭টি সাময়িক প্রবন্ধ—হিন্দু মুসলমান, রাষ্ট্রভাষা, শিক্ষিত সমাজ ও কৃষিকার্য্য, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও বেকার সমস্যা, শিক্ষিত সমাজের বিবাহ, এখনকার ছাত্র, আধুনিক আমরা, আধুনিকা প্রসঙ্গে, বাংলা বর্ণমালা ও বানান, বই কেনা, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, সিনেমা ও সাময়িকপত্র, বাংলা স্টাইল, অতি আধুনিক লেখক, শনিবারের চিঠি ও রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যে দলাদলি, জন্মনিয়ন্ত্রণ, অহিংসা ও অনশন, নারীহরণ প্রভৃতি। অন্য দেশে কোন পাব্‌লিশার প্রবন্ধ-পুস্তককে উপন্যাস বলিয়া চালাইলে তাহাদের ধোপা-নাপিত বন্ধ হইত। কিন্তু যে দেশে নন্দগোপাল সব্যসাচী, সে দেশে সকলই সম্ভব। এই জুয়াচুরি সম্ভবত সব্যসাচীরই—তিনি দাশগুপ্ত কোং-এর হাতে তামাক খাইয়াছেন।

* * *

১৩৪৮ সালে প্রকাশিত অসীম দত্ত ও রমাপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত ছেলেদের বার্ষিকী 'হালখাতা'য় (পৃ. ৭৯-৮১) সব্যসাচী নাড়ুগোপাল একটি গল্প লিখিয়াছেন। গল্পটির নাম "আশ্চর্য্য!" শুধু আশ্চর্য্য নয়, কেয়াবাৎ! গল্পটি আপাদমস্তক চুরি, তাও যেখান সেখান হইতে নয়, মহামান্য টলস্টয়ের সুবিখ্যাত Twenty-three Tales হইতে। এই পুস্তকের দশ নম্বর গল্প "Little Girls Wiser than Men"-কে বেমালুম হজম করিয়া সব্যসাচী আমাদিগকে "আশ্চর্য্য" করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে থাকিলে জানিয়া খুশি হইবেন।

—

গত কয়েক মাস ধরিয়া 'প্রবাসী'তে 'প্রবাসী'-সম্পাদককে লিখিত প্রধানত প্রুফ-দেখা ও লেখা-ছাপানো সম্পর্কিত—রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রগুলিতে তাঁহার পুত্র-কন্যাদের নাম কতবার আছে, দানেশখাঁ ওস্তাদজীর মত সম্পাদক মহাশয় কেবল তাহাই গণনা

করিয়া চলিয়াছেন। অধিকাংশ পত্রের অন্য কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। দুই একটির অবশ্য আছে। যেমন—

...র কাছ থেকে ছবি উদ্ধার করা অসম্ভব হবে। আমাদের অনেক ছবি তার রসিদ সত্ত্বেও পাওয়া গেল না। চিঠি লিখলে উত্তর পাবার আশা নেই।

এই "..."র উপর সম্পাদক মহাশয় কিছুকাল যাবৎ নানা কারণে প্রসন্ন নন। যে কোনও অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে আপন উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োগ করার আর্ট রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানেন। নামটি উহ্য রাখিয়াও এমন ভাবে ইহা ছাপা হইয়াছে যে,....কে চিনিতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং চিঠিখানি সার্থক হইয়াছে।

* * *

আর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

নিজের গান আমাকে শুনতে হবে দলিত অবস্থায়, নিজের কথা আমাকে পড়তে হবে বিকৃত ভাষায় এ আমার ললাটের লিখন।

ঘাগী মোক্তারদের দ্বারা সমর্থিত হইবার লাঞ্ছনার কথা রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত অনুকম্পাবশতই লেখেন নাই।

—

শ্রাবণের 'ভারতবর্ষ' কাব্য-সম্পদে সমৃদ্ধ; এমনটি বহুকাল দেখি নাই। পূরা এক ডজন, দিলীপকুমারের স্বরলিপি সুদ্ধ ধরিলে তেরো—নামকরা কবিরা অনেকেই আছেন, অনামারা তো আছেনই। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির ছোঁয়াচ লাগিয়া কবিতাগুলির অধিকাংশই বেশ স্যাঁতসেতে বলিয়া বোধ হইল—দুই একটিতে যেন ছাতাও পড়িয়াছে। তাহা হউক, সামনের ভাদুরে রোদে একটু শুকাইয়া লইলেই হইবে।

যাক, প্রশংসা করা আমাদের স্বভাব নয়। খুঁত একটু আধটু ধরিয়াছি, সেই কথাই বলিতেছি।

* * *

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের "উপহার" ভারি প্যাথেটিক!

আমার পরাণখানি তোমারে যে দিতে চাই
তোমারে দিবার মোর আজি আর কিছু নাই,
... ...
রিক্ত যে হ'তে চাই।

দেবপ্রসন্নবাবুর বিনয় অসাধারণ, পূর্ব্বপুরুষ যাহা রাখিয়া গিয়াছে —সম্পূর্ণ রিক্ত হইতে তাঁহার অনেক সময় লাগিবে। কবিতাটি ঐ কারণেই করুণ।

* * *

কবিশেখর কালিদাসদাদা কিন্তু "ক্রৌঞ্চীর বেদনা" লিখিয়া ভা কাজ করেন নাই।—দাদা ও বউদির সংসারযাত্রার এমন করুণ বর্ণ আমরা উপভোগ করিলেও সাধারণের কাছে ইহা প্রকাশ করা উচি নয়।

বাসা এযে—নিতান্তই বাসা
কলকাকলীতে ভরা, ভাল-বাসা, অনুদ্ধত আশা
কবোষ্ণ করেছে এরে। আসবাব অতি সাধারণ,
দুখানি কেদারা……ইত্যাদি

তা হউক, তবুও তো "ভাল-বাসা"!

* * *

"মেঘ-মল্লারে" শ্রীঅজিত ঘোষ একেবারেই বেসামাল হইয়াছে "ঘন মেঘজালে" এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, তবু—

দীর্ঘশ্বাসে কুচযুগ টলমল—
বায়ুহিল্লোলে যেন দুটী কিশলয়।

ভাবাতিশয্যে কুবলয় যে কিশলয় হইতে পারে, তাহা আমরা মানি কিন্তু কিশলয়ের মত কুচযুগ দেখিলে ছাগলদের তো ঠেকা যাইবে না।

—

চারণ কবি বিজয়লালকে অনেকদিন পরে আবার বিপ্ল পাইয়াছে। শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে একসঙ্গে "বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ" "বিপ্লবী বঙ্কিমচন্দ্র" দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছি। জড় ভগবান তাঁহা শান্ত করুন।

—

"একটি প্রেমের কবিতা" পড়িতেছিলাম। আষাঢ়ের 'পরিচ বাহির হইয়াছে। লেখক কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে একজন, পুঁচকে-প্র ধূর্জ্জটিবাবুর ভাষায়—ঘরানা ঘরের লোক।

চুপিসারে ঐ মরণ
ছড়ায় বামন চরণ
স্বার্থের ইসারার
সে মানে না ব্যাকরণ
ইতিহাসের ধারায়।
সোনালি ঈগল তবু
নেহাৎ ব্যক্তিগত
বেদনায় জবুথবু,
শেষবার পাখা ঝাড়ে
মরীয়া মর্মাহত।

গোপালদা চেঁচাইয়া উঠিলেন, থাম, থাম, একে বিরহে মরছি, আর দগ্ধে মেরো না ভাই। "শূন্য ব্যোম অপরিমাণ"-জাতীয় একটা তাগদের কবিতা শোনাও।

তাহাও ছিল হাতের কাছে ঐ 'পরিচয়ে'ই, পড়িলাম—

বাচ্য বস্তু বিচারের বিবেচ্য বিষয়
বিধিবহির্ভূত হ'লে হয় কক্ষচ্যুত—
সূর্য্য-পরিক্রমা পথে। নৈরাজ্য উদয়
নৈর্ব্যক্ত বিপ্লবী আত্মা করে মনঃপূত।
ঐস্পাতিক সভ্যতার রৌপ্যশুভ্র মনে
পরস্বাপহারী বিদ্যা নিত্য বিদ্যমান।
মূর্খে করে আপ্যায়িত লভ্য আকর্ষণে
অভ্যাসে সভ্যের মত সাজিয়া বিধান।

গোপালদা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া শুইয়া ছিলেন, তড়িতাহতের মত খাড়া হইয়া বসিলেন, বলিলেন, বহুত খুব! এই তো চাই। সুধীন্দ্রনাথ—

বলিলাম, ভুল হ'ল গোপালদা, সুধীন্দ্রনাথ নন।

গোপালদা তক্তাপোশে একটা থাবা মারিয়া বলিলেন, আলবৎ সুধীন্দ্র। শব্দ-সমাবেশের এমন নৈরট্য ও নৈরন্ধ্র্য আর কারও কলম থেকে—

'পরিচয়' খুলিয়া লেখকের নামটা গোপালদাকে দেখাইলাম। গোপালদা আবার তাকিয়ায় হেলান দিলেন ও অবদমিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "একটি প্রেমের কবিতা"ই পড় ভাই।

—

শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে মল্লারের যে ত্রিবর্ণ চিত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য। চিত্রকরের নামের পরে ব্র্যাকেটে "লাঠী" কথাটি ছাপা হইয়াছে; রোগীর সঙ্গে ঔষধেরও নাম ছাপিয়া কর্তৃপক্ষ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

—

আষাঢ়ের 'মোহাম্মদী'তে আজিজুর রহমানের "কবিতা"য় মিলহীন কবিতার পক্ষে যে সাফাই গাওয়া হইয়াছে, তাহা পড়িবার পর আমাদের আর কোনও অভিযোগ নাই। যাহারা "তেতলায় ফ্যানের নীচে আর কেদারায় বসে" কবিতা লেখে, তাহাদের কবিতায় মিল থাকা উচিত কিন্তু যাহারা—

কেরোসিন কাঠের প্রাগৈতিহাসিক তক্তপোষে বসে
কলাই-চটা টিনের থালায়
লুঙ্গী পরা
নিগ্রো-প্যাটার্ণ নোঙরামির প্রতীক
কোনো পরিবেশকের হাতে
পাইস সিষ্টেমে খানা

খায়,

দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত
মাইনে পাবার অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করে
ক্লান্ত দেহে পুরানো সিন্ধুকের মতো একটি ঘরে
ইঁদুরের মতো ঢুকে এলিয়ে

পড়ে, তাহারা কবিতা মিলাইবে কোন্ সুখে? সাধু।

—

অনেক লেখক 'শনিবারের চিঠি'র জন্য ছদ্মনামে লেখা পাঠাইয়া থাকেন। লেখা ছদ্মনামে ছাপানোর কোন আটক নাই, কিন্তু তাঁহারা মনে রাখিবেন, লেখকের প্রকৃত নাম ও ঠিকানা সঙ্গে না দেওয়া থাকিলে

সে লেখা ছাপা সম্ভব হয় না। নাম ঠিকানা না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়াও অসম্ভব হয়।

এইরূপ বহু নামহীন লেখা আমাদের হাতে জমিয়া রহিয়াছে; তাহার লেখক-লেখিকাদিগকে লেখার নাম সমেত নিজের নাম ও ঠিকানা জানাইতে অনুরোধ করিতেছি।

—

সম্পাদকীয় অসুস্থতা ও ব্যস্ততার অবসরে 'শনিবারের চিঠি' সংক্রান্ত বহু চিঠিপত্র ও প্রাপ্ত রচনা জমিয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি সেগুলির উচিত ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইতেছে।

ইহার মধ্যে দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্ত পত্র এবং রচনাও অনেক আছে। যে সমস্ত চিঠিপত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে, তাহার যথাসম্ভব উত্তর আমরা এখন দিব। যে সমস্ত রচনা হাতে জমিয়াছে, তাহাও যথাসাধ্য শীঘ্র পড়া ও বাছাই শেষ করিব, এবং 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশের জন্য যেগুলি রাখা যাইবে না, তাহা লেখকদের কাছে ফেরত পাঠাইব। যে সকল রচনা আমরা বাছিয়া রাখিব, তাহার লেখকদিগকে সে সংবাদ পত্র দিয়া জানাইয়া দিব।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে লেখকেরা ও পত্রলেখকরা অনেকে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র নূতন ঠিকানা জানাইতে অনুরোধ করিতেছি। নূতন ঠিকানা না পাইলে আমরা বাধ্য হইয়া পুরাতন ঠিকানাতেই লেখা ফেরত পাঠাইব; তাহাতে লেখা হারাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

লেখকরা অনুগ্রহ করিয়া ১৫ শ্রাবণ তারিখের মধ্যে নূতন ঠিকানা আমাদিগকে জানাইবেন। ঐ তারিখের পর হইতে লেখা ফেরত পাঠানো আরম্ভ করিব। যাঁহারা কলিকাতায় আছেন, তাঁহারা ইচ্ছা

করিলে এখন হইতেই অফিসে আসিয়া রচনার সম্বন্ধে সংবাদ জানিয়া যাইতে পারেন।

—

পুনঃ পুনঃ বারণ করা সত্ত্বেও যে সকল উৎসাহী গ্রন্থকার ও প্রকাশক 'শনিবারের চিঠি'তে সমালোচনার্থ পুস্তক পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, এই ধরনের উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকের ন্যায্য সমালোচনা করা সম্ভব নয়। পূজার বাজারে তাঁহাদের উপকারার্থ এক ধরনের বিজ্ঞাপন-মার্কা পরিচয় আমরা ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে প্রকাশ করিব।

———

নবপ্রকাশিত একখানি সঙ্গীত পুস্তক

সঙ্গীত সূত্র ও মাত্রা শিক্ষা। বাণীদাস সম্পাদিত। এই পুস্তিকায় অল্প কথায় সঙ্গীতের উপপত্তি বিষয়ক নানা তথ্যের অবতারণা সহজবোধ্য সরলভাষায় করা হইয়াছে। পুস্তকখানির উদ্দেশ্য সঙ্গীতের উপপত্তি সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল ও আগ্রহ কিঞ্চিৎ উন্মেষ করা। সপ্তকের স্বরগুলির পরস্পর খাঁটি ও বিজ্ঞানসম্মত অন্তর কিরূপ ও হারমোনিয়ম পিয়ানো আদির উক্ত অন্তরের কি পার্থক্য বিশদভাবে বোঝান আছে। পরিশিষ্টে হার্মনি বা বহুমিল সম্বন্ধে একটি অধ্যায় ও তিনখানি হার্মনিযুক্ত গতের স্বরলিপি আছে। মূল্য ২৲ টাকা।

Dwarkin & Son LTD.

11, ESPLANADE
CALCUTTA

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত (সমু

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত